







# মরণোন্মত্ত

শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী  
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

“চুঁচুড়া-বার্ভাবহ” কাৰ্য্যালয় হইতে  
ঔষ্যানেশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়  
দ্বারা প্রকাশিত ।

—দেড় টাকা—

মুদ্রাকৰ—ঔষ্যানেশ্বনাথ মিত্র  
ত্ৰীপতি প্ৰেচ,  
৩৮, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

## —সূচী—

মরণোন্মাদ	...	..	...	১
মাতৃকবরী	..	.	...	১২
মনোরমা	...	...	..	১৬
পোষ-কালী	...	...	...	৩৪
'দেশে'র টান	...	.	...	৪৫
পথরোধ	...	...	...	৫৪
কেরাণী	...		...	৬৮
"জীবনে বত পূজা হ'ল না সারা—"				৮১
পাগল	...	...	...	১০৭
কুলী	...	...	...	১২৭

---



## ভূমিকা

শ্রীমান্ অনাদি মুখোপাধ্যায়ের লেখা আমি পড়েছি।  
প'ড়ে ভালোও লেগেছে। কিন্তু ঐটুকু বললেই ভূমিকা  
লেখার কর্তব্য শেষ হয় না।

দিনের আলো পরিস্ফুট হবার আগের উদয়-গোধূলি-  
বাগ মন এবং চোখ দুইকে বেশী আকৃষ্ট করে।

শ্রীমান্ অনাদির লেখায় উদয়-গোধূলির রক্ত-রাগ  
দেখেছি। তাঁর আকাশে নতুন আলোর আগমনী  
সঙ্গীত শুনেছি।.....

এঁর ছোট গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, এগুলি গল্পও  
হয়েছে এবং ছোটও হয়েছে। ভাষাও রসালো এবং  
জোরালো। এক-আধটু ক্রটি-বিচ্যুতি যা আছে, তা হাত  
পাকুলে আপ'নি সেরে যাবে।



বাগ্‌দেবীর পূজা-দেউলে আর এক নবীন পূজারী  
এলেন তাঁব অর্ঘ্য নিবেদন করতে, আশা আছে—দেবী  
প্রসন্নচিত্তেই এ পূজা গ্রহণ করবেন। দেবী-মন্দিরের  
‘পুরোহিতদের কাছে শুধু তাঁর পরিচয় ক’রে দিয়েই আমি  
বিদায় নিচ্ছি।

আরো অনেক লেখাব ছিল, সময় হ’ল না। রুজের  
ডমরু আমায় ডাক দিয়েছে বাগ্‌দেবীর দেউলাঙ্গন  
থেকে। ইতি—

কলিকাতা

২১শে পৌষ

১৩৩৭ সাল।

জিহ্ম ইন্দ্র

—যেখানে বিনা-কৈফিয়তে সকল বোঝা নামিয়ে  
দেওয়া যায়, সেই ভূ-স্বর্গ—মাতা-পিতৃ-চরণে  
অগণিত নর-নারীর ব্যথার-বোঝা  
নিয়ে হাজির হনুম ।

ঈশ্বরদী



## মরণোন্মাস

বৎসর পাঁচ-ছয় 'ইন্টার্ণ' থাকিবার পর যখন মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিলাম তখন যুগ-প্রবাহ-ধারা পূর্বোপেক্ষা আরও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। স্বদেশী-যুগের কল্প নাচন একদিন বেভাবে দেশগল্প ভাবের জোয়ার বহাইয়া দিয়াছিল, আজ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহা ভিন্নভাবে—স্বতন্ত্ররূপে চলিয়াছে। তখন 'বোমা-গ ডা-বাক্যালী' বলিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা পাইতাম, কিন্তু ভাস্ক-পথে পরিচালিত হইয়া থাকিলেও এখন তাহাদেরই নিকট শ্রদ্ধা-ভয়-বিস্ময়-ভক্তির সংমিশ্রণ একটা আদব পাইতে লাগিলাম।

বঞ্চিত নরনারীর স্বাধিকার তাহাদের হাতে পুনরায় তুলিয়া দিতে পারিব ভাবিয়া তখন আনন্দে ভিতরের এবং বাহিরের সব দুঃখকে যেন তুলিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু বাস্তবীতে ফিরিয়া রুগা বৃদ্ধা-মাতা, শীর্ণা স্ত্রী ও বুড়ু শিশুগুলির প্রতি চাহিয়া পথের জীবন শেষ করিতে হইল,—ঘরের জীবনে মন দিলাম।

## অরণোদ্যোগ

চাকরীর জন্ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই ঝাঁপে গিয়া পড়িলাম, কিন্তু পুলিশের নেক-নজরকে সকলেই ভয় করিল।

যাহাদের জন্ত আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া লক্ষীছাড়া সাজিয়া-ছিলাম, তাহারা আমার ত্যাগের মূল্য বুঝিল না।

দিন কয়েক পরে আমার সাংসারিক দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া আমার স্বর্গত পিতার বন্ধু, বড় আদালতের সরকারী উকিল সত্যেন বাবু আমায় ডেকে বললেন, “তোমার অবস্থার কথা আমি বুঝিতে পেরেছি। তোমাকে আমি কিছু কিছু সাহায্য করতে চাই, তুমি খেচ্ছা ত তা নিতে পারবে ত?”

দান ভিক্ষার নামান্তর ভাবিয়া আমি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলাম। গান্ধীব্যের সহিত কহিলাম, “না, আমি তা নিতে পারব না।”

নিরন্তর বেদনা সত্যেনবাবুর প্রাণে সত্যই বাজিয়াছিল। তিনি আগার উপর জোর করিয়া বলিলেন, “জান, তুমি আমার বন্ধুপুত্র,—একরকম আত্মীয় বললেও চলে। আমার কাছে তোমার গান্ধীখ্য দেখান খাটে না।”

আমি বিনয় সহকারে কহিলাম, “সত্যেনবাবু, আমার গান্ধীখ্য—অভিমান বা অহঙ্কারের নয়, এ গণ্ডীরতা,—বেদনায় মথিত হইয়ে আপনা হ’তেই সৃষ্ট হয়েছে। আমি নিরর্থক আপনার কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারব না।”

## অরণোত্তর

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার পর সত্যেনবাবু কহিলেন, “আজ্ঞা, কাজের মূল্য স্বরূপ তুমি তা নিতে পারবে ত ?”

আমি বলিলাম, “তা পারি।”

সত্যেনবাবু কহিলেন, “তাহলে কাল থেকে আমার ছেলেকে ঘণ্টাখানেক ক’রে পড়িয়ে যেও।”

আমি ঘাড় হেঁট করিয়া তাহাতে সম্মতি জানাইলাম।

( ২ )

ছেলে পড়ান অভ্যাসটা আমার কখনও ছিল না। কেমন করিয়া পড়াইব, কি পড়াইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। মুক্ত-অস্তরীণের সহিত সরকারী উকিল-পুত্রের কখনো খাপ খাইতে পারে না জানিয়াও পেটের জ্বালায় পরদিন সত্যেনবাবুর বাটিতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, সেই ক্রীড়া চক্ৰ, হাস্তময়, ষাটশব্দীয় বিজয়কুমার প্রথম সাক্ষাতেই আমার সমস্ত মন অধিকার করিয়া লইল।

তার সুদর্শন চেহারা, সরল কণ্ঠস্বর, ছলনা-কপটতাহীন মুহূর্ত্তাব, স্বচ্ছন্দগতি দেখিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই যে, এই জীবন্ত বালকের ভিতর কি আকাজক্ষা নিহিত ছিল। তাহার বেদনার পাত্র যে আমাদের অপেক্ষাও গভীর ও ভরপূর ছিল—তাহা তাহার টান টান চক্ষুদ্বয়েই লেখা ছিল, কিন্তু তখন তাহা পড়িতে পারি

## বরগোলাস

নাই। বলিতে কি,—রাজনীতির সহস্র চাল চালিয়া আসিয়াও তাহাকে বুঝিবার ক্ষমতা তখনও আমার হয় নাই।

তাহাকে পড়িবার বইগুলি আনিতে বলিলাম। সে বইগুলি লইয়া আসিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিয়া প্রথম হইতেই আমার সহিত আলাপ জমাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার ভিতরকার খবরগুলি জানিবার তাহার যেন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কহিল, “মাষ্টারমশাই, আপনাকে পুলিশ এতদিন আটকে রেখেছিল কেন?”

বিপদে পড়িলাম। কহিলাম, “তুমি ছেলেমানুষ, সে কথা এখন বুঝিতে পারবে না।”

কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নয়। কহিল, “আপনি যদি বুঝি, বলেন, আমি কেন বুঝিতে পারব না?”

চিব-জ্যোৎস্না-বিরাজিত বালকজুদয়ে আনন্দে রণগোলাসের ধূয়া ধরাইয়া দিলে তাহার শিক্ষায় বাধা পড়িতে পারে ভাবিয়া এবং সরকারী উকিলের পুত্রের নিকট রাজনৈতিক আলোচনা দোষনীয় এ নিজেদের সমূহ ক্ষতি বিবেচনায় একটু ধমক দিয়া কহিলাম, “আচ্ছা, সে আর একদিন বলব। আজ পড়া আরম্ভ কর।”

বিজয়কুমার পাড়তে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু গনে হইল সে যেন অল্প কোন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

( ৩ )

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে।

ইহাব মধ্যে বিজয়কুমার শিক্ষায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা আমি ও সে নিজে ভিন্ন আর কেহই জানে না। এতদিন ধরিয়া সে আমাদের গুপ্ত-সমিতির কথা, দেশ-বিদেশ ভ্রমণের কথা, অস্তরীণের কথা, বঞ্চিত পরাধীন নর-নারীর কথাই কেবল শুনিয়া আসিয়াছে। দেশের কথা বলিতে বলিতে আমিও যেন আত্মহারা হইয়া ঝাইতাম; দারিদ্রের তাড়নার পড়াইতে আসিয়াছি—সে কথা! আদৌ মনে থাকিত না।

বাটার মধ্য হইতে জলখাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বিজয়কুমার কহিল,  
“মাষ্টারমশাই,—মুন্সিল!”

আমি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হল?”

বিজয় কহিল, “বাবা এবার আমার পড়াব একজামিন্  
নেবেন!”

আমাব অস্বাভাব্য শুকাইয়া গেল। কহিলাম, “আজই নাকি?”

বিজয় হাসিয়া বলিল, “আজ ভয় নেই, মাষ্টারমশাই, কাল  
করবেন বলেছেন।”

তাড়াতাড়ি বই খুলিয়া পড়িতে বলিলাম। বিজয় অগ্রাহ  
কবিয়া কহিল, “বাবা আজ ত আর একজামিন্ করবেন না, সে  
কাল পড়া হাবে এখন। আজকে সেই পুলিশে ধরাব গল্পটা  
বলুন।”



## অরণোন্নাস

পুলের পরীক্ষা লইতে যাইলেই আমার অক্ষমতা, অলসতা সবই সত্যেন বাবুর নিকট প্রকাশ হইয়া বাটবে। হয়ত—কেন,—নিশ্চয়ই তিনি আমাকে তাড়াইয়া দিবেন। তখন যে দুঃখে ছিলাম সেই দুঃখই আবার ফিরিয়া আসিবে। ভবিষ্যতের অশ্চিন্তার কথা মনে পড়িল। এতদিনের নিজের অবহেলার কথা ভুলিয়া আত্মিকার বিজয়ের অগ্রাহ্যের উপরই সব দোষ চাপাইলাম। সক্রোধে বিজয়ের কান ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিলাম, “আজই তোমাকে সমস্ত বই পড়ে শেষ করিতে হবে।”

তাহার চক্ষু, নাসিকা, গণ্ডময় অভিমানে আরক্ত হইয়া উঠিল। ব্যথিত কক্ষণস্থরে কহিল, “আমাকে মারবেন না মাষ্টারশাই,—আমার যে মা নেই।”

“মা নেই”—এই বেদনা মাথা কথাটি আমার আজন্ম বেদনার উপর আরো যেন ভার চাপাইয়া দিল। স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগে বলিলাম, “ওরে, আজ সমগ্র মাতৃহারা দেশ আবাত পেয়ে ঠিক তোরাই মত ‘মা নেই’ বলে কাঁদছে। আমি মাতৃহারার গায়ে হাত তুলে তুল করছি। সে বেদনা যে কত দুর্ভিষহ তা মাতৃহারা দেশবাসী আজ হাড়ে-হাড়ে বুঝছে। তাই তারা তাদের মাকে ফিরে পাবার জন্যে এত করে খুঁজছে !

বিজয় হঠাৎ আমার আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া চমকিত হইয়া

## অরণোদয়

জিজ্ঞাসা করিল, “হাবাণ মাকে খুঁজলে কখনও কিরে পাওয়া যায় ?”

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে বলিলাম,  
“তা পাওয়া যায় বৈ কি।” মনে মনে ভাবিলাম,—“না পাওয়া  
গেলে মাতৃহারা দেশের আজ মাতৃ-সম্পর্শনের এত চেষ্টা কেন ?

বিজয় সজল-নয়নে আগ্রহ সহকারে কহিল, “আমার মাকে  
তাহলে পাওয়া যেতে পারে ?”

সহসা উত্তর দিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া  
ধাক্কিতে দেখিয়া বিজয়কুমার পুনরায় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,  
“বলুন না,—পাওয়া যায় কিনা ?”

বলিলাম, “তা,—পাওয়া যায়।”

বিজয়ের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিল, “কেমন ক’রে ?  
আমার মাকে আমি কখনও দেখিনি, আমার যখন একবৎসর বয়স  
তখন মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁকে দেখতে আমার  
ভয়ানক ইচ্ছে হয়।”

কঠিন সমস্যায় পড়িলাম। একটা উত্তর দিতে না পারিলে  
রেহাই নাই ভাবিয়া কহিলাম, “এখন কি ক’রে দেখবে। মাতৃ  
যখন তার সব কাজ শেষ ক’রে এখান থেকে চলে যায় তখন  
মৃতজনের সঙ্গে দেখা হ’তে পারে।”

এতদিন পরে যেন পথ পাইয়া বিজয় আশ্বাসন করিয়া কহিল,

## মরণোন্নাস

“মরলে দেখা পাওয়া যায়? তবে ত শিগ্গির শিগ্গির মরলে আমিও শিগ্গির শিগ্গির মা’র কাছে যেতে পাব?”

মা’কে কিরিয়া পাইবার আশায় একটা বালক মরণকে এমন মধুর করিয়া লইতে পারে ভাবিয়া আমার ভয় হইল। মায়ের আস্থান যে পুত্রকে পাগল করিয়া দেয়, তাহা দেশের যৌবনকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষুদ্র বালককেও যে উন্মাদ করিতে পারে তাহা ভাবি নাই। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, “তা বলে আশ্চর্য্য ক’রোনা যেন বিজয়। তার মত পাপ আর নেই। যখন স্বেচ্ছায় মৃত্যু হবে তখন মা’র কাছে যেও।”

এতক্ষণ সত্যেন বাবু পিছনে দাঁড়াইয়া আমাদের সমস্ত কথাবার্তা যে শুনিতেছিলেন তাহা আমরা কেহই টের পাই নাই। হঠাৎ শিহরিয়া তাহার প্রতি চাহিতেই তিনি বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, “তুমি কি বিজয়কে এখানে প্রেত-লোক-ভৃশ্ব শেখাতে এসেছ?”

তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, “রোজই এইরকম গল্প হয় শুন্তে পাই,—বই বোধ হয় একদিনও খোলা হয়নি?”

আমার বাকশক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল। কোনক্রমে “আজ্ঞে,—হাঁ,—না” করিয়াই থামিয়া গেলাম।

তিনি আর বাস্তবতা না করিয়া নিরব্ধি বিজয়কুমারের সর্ব্বাঙ্গ প্রহারে জর্জরিত করিতে লাগিলেন।

## মরণোক্তাস

কিন্তু বিজয়ের ত কোন দোষ নাই!—সে নির্দোষ। বুঝিলাম সত্যেনবাবু আমার প্রতি আক্রোশ বশতঃই পুত্রকে প্রহার করিতে-ছেন। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে বিজয়কে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে আগুলিয়া দাঁড়াইলাম।

সত্যেনবাবু ক্রোধে উন্নত হইয়া বেশী কথা কহিতে পারিলেন না, রক্তুলি নির্দেশে আমাকে বাহিরের দরজার প্রতি দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, “সবে যাও।”

সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইলে ক্রোধের উপশম হইতে পারে ভাবিয়া আমি বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

পরদিন মাতা-স্বী-পুত্রের মুখ চাহিয়া পুনরায় সত্যেনবাবুর ঘরে যাক্কনা ভিক্ষা করিয়া পড়ানটা বজায় রাখিবার জন্য যাইলাম। কিন্তু শুনিলাম বিজয়কুমার কাল হইতেই জরে অচেতন, এবং আমার মত শিশুক সত্যেনবাবু আর রাখিতে চাহেন না।

\* \* \* \* \*

দিন আষ্টেক পবে সংবাদ পাইলাম যে বিজয়ের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন—বাঁচিবার আশা খুব কম।

অভিমান, অপমান লজ্জা, তিরস্কার সব তুলিয়া বিজয়ের শয্যা-পাশে ছুটিয়া যাইলাম। দেখিলাম, ডাক্তারেরা জবাব দিয়া নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন।

## মরণোন্মত্ত

আমাকে দেখিয়া বিজয় জড়িতকণ্ঠে কহিল, “দেখুন না, আমি আমি আর বাঁচতে চাইনা তবু এরা আমাকে বাঁচাবার জন্তে কত চেষ্টা করছে। ওদেরকে বলে দিন না যে আমি আমার মার কাছে যাচ্ছি,—আমার মা ডাকছে।”

এই মর্মভঙ্গ কথার বলা হইতে তাহাকে নিবন্ত করিবার জন্ত তাহার কথা চাপা দিয়া বলিলাম, “তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে বিজয়?”

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়াও সে মুখে কাতরতার কোন চিহ্ন দেখিহে পাইলাম না। সীমাহীন আনন্দে সে মুখ অপূর্ব স্নেহভাষায় উঠিল। একমুখ হাসিয়া বিজয় কহিল, “মাষ্টারমশাই আপনিই ত বলেছিলেন মাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা সব কষ্টই চাপা দিয়ে দেয়। আমারও এ মরণে ত কোন কষ্ট নেই। এ মরণ যে আমার আনন্দের—উন্মত্তের। এবার যে আমার মাঝে আমি সত্যিই দেখতে পাব।

এই ক্ষুদ্র বালকের মরণোন্মত্ত দেখিয়া আমাদের সেই গুপ্ত-সমিতির মরণোন্মত্তের আফলন মনে পড়িল, দেশ-জননীর চরণদর্শনের প্রতিক্ষা মনে পড়িল। সে মরণ বরণ করিয়াও ত আমরা মাকে পাই পাই; কেবল নির্যাতন ভোগ করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন বুঝিলাম যে হিংসাত্মক আত্মরিক্ততা দ্বারা মাতৃপূজার অধিকারী হওয়া যায় না।

## মরণোন্মত্ত

বিজয়কুমার আরও কি যেন বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু আর মুখ খুলিল না। চিরজন্মের মত ধীরে ধীরে তাহার সেই বড় বড় চক্ষুদ্বয় মুদিত হইয়া গেল। অনিন্দ্যহৃদয় মুখখানি তেমনি জ্যোতির্শূন্য হাসিতে ভরিয়া রহিল। বিজয়কুমার বিজয়ী হইয়া চলিয়া গেল।

ক্রমশঃরোল উঠিল, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত যোগ দিয়া কাঁদিতে পারিলাম না। ধীরে-ধীরে সেই হিম-শীতল দেহের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া এই হৃদয়, শুভ, সুখদায়ক, মহিম্ব মরণোন্মত্তের চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলাম।



## মাতবরী

মুখ ত কারো আটকানো যায় না , পাড়ার লোকে পাঁচ কথা বলবে সে আর বেশী কথা কি ।

কেউ বলে,—“এমন যে ঘটবে তা আমি বহু পূর্বেই জানতাম ।”

কেউ বলে,—“দোষ কিন্তু দস্তখুডোরই ; ওরকম স্তম্ভরী মেয়েকে কি পাঁচজনের চোখ থেকে আগলে রাখা যায় ।”

—“আমি কিন্তু তাই ওর প্রথম চাউনি দেখেই ধরে ফেলেছিলাম যে ও কখনই ভাল ঘরের মেয়ে হ’তে পারে না ।”

—“আমিও তার বেহায়াপনা বেশ ভাল করেই পরখ করেছিলাম । ভদ্রলোকের মেয়ে, গেরস্তোর বউ যে এমন ঘোমটা খুলে আঁচল দুলিয়ে বেড়ায় তা’ কখন জানতাম না ।”

—“তাহলে সেদিন পূবুপাড়ায় দুটো অচেনা লোককে ত আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম ।”

—“ওরে, সেই ছ’বেটাই হবে , আমিও তাহলে ঠিক দেখেছি । দরুন্দের গোয়ালঘরের পেছনে ছ’বেটার কুস্কুসু করছিল , আমায় দেখেই একেবারে দৌড় । যদি ধবুতে পারতাম তাহলে একবার—”

## শাভকবরী

—“আরে, সহরে মেয়ে আর পাঁচভাতারী একই কথা ! ‘দেশো’ দস্ত মনে করেছিল, সহরে মেয়ে বিয়ে করে আমীরওয়রাও সেজে আমাদের তাকু লাগিয়ে দেবে। এখন বাছাখন বোঝ, জাতও হারালে পেটও ভরুলো না।”

এই রকম কথা নিয়ে বারোয়ারীতলার খড়ের গাদার দক্ষিণ-গায়ের যুবকদের দৈনন্দিন আজ্ঞাটী বহুদিন নীরস ভাবে কাটানোর পর এ দু’দিন বেশ সরস ভাবেই জমেছে।

জম্বার কথাই ত। গায়ের ভেতর থেকে নতুন সমথ বউ বেমালাম উধাও হয়ে গেল আর ছেলেরা সে বিষয়ে কি ছুটো কথা কইতেও পাবে না ? ভাল ঘরের মেয়ে যদি হ’ত, তা’হলে কি তাবা। এমন ভাবে বসে থাকত,—নিশ্চয়ই তদন্ত করে বা’র করতো।

দস্তগুড়ো ও তৎপুল ‘দেশো’ ওবকে দাস্তুরখি এ দু’দিন লজ্জায় বাড়ীর বাহির হয় নাই। পিতাপুলে দাওয়ার বসিয়া কত আঙ্গুপই না করিতেছে।

দস্ত বলেন,—“ভুই যদি মাঝখর না করে বউটাকে ভাল করে বোঝাতিস্ তা হলে এমন কেলঙ্কারীটা ঘটতো না।”

—“মাঝখর আর এমন কি করেছিলাম, বাবা ? মিষ্টকথা কি আর বলিনি,—বলে বলে হাস্যরাস হয়ে গেছি।”

—“তা জানি, তবু সহরে নেয়ে,—পাড়াগায়ের খাট্‌নি কি তাদের হঠাৎ সহ হয় ?”



## অরণোদাস

“সহরে মেয়ে বলে কি স্বস্তরবাড়ী এসে কাজকর্ম করবে না ? বিবি সেজে বসে থাকবে ! যাক, গেছে যখন চুলোয় যাকগে । তুমি আজই তোমার বেয়ানকে চিঠি লিখে দাও—যেন ও মেয়ে এ বাড়ীতে আর না পাঠান হয় । পালিয়েছে যখন তখন বাপের বাড়ীতেই আজন্ম বাস করুক, আমি আবার বিয়ে করবো ।”

—“আমি বলি, পালিয়েই যদি গিয়ে থাকে ত কা’রো সঙ্গে যেতে হবে ত ? আর কোন্ সময়ই বা পালান ? গাঁয়ে এতগুলো লোক,—কা’রো কি নজরে পড়লো না ?”

—“সহরে মেয়ের কিছুই অসাধ্য নেই বাবা । তারা একলা মক্কার মত পৃথিবী ঘুরে আসে, আর সামান্য এই বাপের বাড়ী পর্যন্ত যেতে পারবে না ?”

অবশেষে নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থার পর ঈর্ষ্যা এবং মূতন বিবাহের সঙ্কল্প-ই পিতাপুত্রের স্থির করিয়া ফেলিল ।

কিন্তু সমাজ । তার যে আজ ‘পোয়া বারো’—সে ছাড়িবার পাত্র নয় ত । পঞ্চায়েৎ বসিল, মাতব্বরও জুটিল অনেক ।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর দস্তখতোকে ডাকাইয়া, স্বতন্ত্র স্থানে বসাইয়া জানান হইল,—“যে হেতু দল, গ্রামের বন্ধুদের সহিত পরামর্শ না করিয়া সহরের মেয়েকে বধু করিয়া গৃহে আনিয়াছিল, এবং কঙ্কার পিতার নিকট হইতে অজস্র অর্থ যৌতুক-স্বল্পপাইয়া ও ‘গ্রাম-ভাটা’ ও বারোয়ারীর চান দেয় নাই, অধিকন্তু যেহেতু তাহার

## মাতব্বয়ী

পুত্রবধু পবপুৰুষেব সহিত নিশীথে কুলটাব স্তায় পলায়ন কৰিয়াছে  
সেই হেতু দত্তবংশ অন্ত হইতে জাতি হাবাইল এবং ‘একঘবে’  
হইল।”

চিন কুড়ি পবেব কথা।

‘মেধো’ বাউবী নূতন-পুৰুষে জাল ফেলিতেছে,—জমিলাব বাব  
বেহাই বাড়ি আজ মাছেব তন্ত পাঠাইবেন।

আজ্ঞাব ছেলেবা সকলেই পুৰুষ পাড়ে জমা হয়েছে।  
মাতব্বববাও কোমবে হাত দিবে মাতব্বব কৰুতে লেগেছে,—ছোট  
বড় মা’ হোক একটাৰ প্ৰত্যাশায়।

বাব পাঁচ চম জাল ফেলাব পব এবাব জাল বেগ ভাবি ঠেকল।  
বস্ত পচা দুৰ্গন্ধ বা’ব হচ্ছে কেন ?

ঘাটেব উপৰ জাল তুলেই ‘মেধো’ চৌকাৰ কৰে বলে  
উঠলো,—“এ যে মাৰুগ গো।”

সকলেই কোতুহলাক্ৰান্ত হইয়া নাকে কাপড দিয়া জাল ধিবিয়।  
দাঁডাইল। গলিত শবেৰ বিকৃত অবস্থা দেখিয়া কেইই নিৰ্ণয়  
কৰিতে পাৰিল না যে কা’য় মৃত নেহ।

বহুক্ষণ পবে আজ্ঞাব ছেলেদেব মৰ্য্য হইতে কে একজন  
অনিচ্ছাসহে ও মৃত শবে বলিদ্ধা ফেলিল,—“এ যে ‘দেশো’বই বউ  
দেখ্‌ছি।”

মাতব্ববেবা একে একে সেই স্থান হইতে নিঃশব্দে সবিদ্ধা গেল।

## মনোরমা

( ১ )

তিন বছরের খাজনা বাকীর দায়ে হুসেন হালদারের বাস্তুবাটী সরকারী ঢাক বাজাইয়া নিলাম হইয়া গেল। নায়েব মহাশয় বেনামায় তাহা ডাকিয়া লইলেন।

মহামায়া ধীরে ধীরে স্বামীকে কহিল, “ওগো, আজ যে মনোব বিয়ে। তার মুখ চেয়ে, বিপিনের মুখ চেয়ে একবার দেখলে না ? তোমাব মুখ দিয়ে কি একটা বা’ও বা’র হল না।”

হুসেন দরজার পাশে ঠাঁটু ছোটো কপালে ঠেকাইয়া অশেষদমন বসিয়াছিল। মহামায়াব প্রতি মুখে তুলিয়া তাহার কথাগুলি চক্ষু দিয়া একবার গিলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পাবিল না। হাত বাড়াইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অশ্রুটে কহিল, “এব।”

মহামায়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া উঠাইল। হুসেন বাটীব চতুর্দিক একবার বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল। নানাস্থান হইতে আগত চালে গৌড়া কতকালের পুয়াতন ও বিবর্ষ পোষ্টকার্ডগুলি একে একে দেখিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সন্ত-কর্ত্তিত ভিমানের হুন্নির প্রতি একবার চাহিল। শয়ন গৃহের দ্বারের উপর একটা

## মনোরমা

কাঁচভাঙ্গা অম্পট সত্যনারায়ণের ছবি ঝুলিতেছিল, স্বরেন স্ববজ্রোড়ে তাকে প্রণাম করিল। তারপর বিপিন ও মনোরমার হাত ধরিয়া ভাঙ্গা গলায় কহিল, “চল।”

বিপিন ক্রমশ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, “কোথায়?” এ কথাই উত্তর স্বরেন খুঁজিয়া পাইল না, সে নিজেই জানেনা কোথায় যাইতে হইবে। কহিল, “তাতে জানিনা।”

মহামায়া স্বামীর পদদ্বয় ছড়াইয়া গরিয়া কহিল, “আজকেব দিনটা যাহোক করে থাক, মনোর বিয়েটা এইখানে শেষ হয়ে যাক, তারপর কাল মনোর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বা’ব হয়ে যাব।”

স্বরেন হালদাবের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, দীর্ঘ উদ্বেগ দিতে পারিল না। শুধু কহিল, “না, পরের বাড়ী।”

“তবে জমিদার বাড়ী গিয়ে এর কোন একটা বিহিত করবে চল। একটা দিনের জন্য তাঁরা কি দয়া করবেন না?”

স্বরেন সজল চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিল, “কা’রো কাছে যাবনা, সব পিশাচ,—সব শয়তান,—জগতটা শয়তানীতে ভরা,—ভগবানও শয়তানের গোলাম!” বলিতে বলিতে সকলকে লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওপাড়ার বিধবা বামুনদিদি অস্ত্রান্ত মেয়েদের লইয়া আনাজ হুটিতে আসিয়াছিল, দীয়ে দীয়ে ঝটীটি কাত করিয়া বাগিয়া

## মরণোন্মত্ত

কহিল, “যার তিন বছরের খাজনা বাকী, তার মেয়ের বিষয়ে  
এত ধুম কেন বাপু?” তারপর ছুঁটো ফুলকপি আঁচল চাপা দিয়া  
লইয়া নিঃশব্দে খিডকী দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরপক্ষেরা মধ্যপথে খবর পাইয়া বর ফিরাইয়া লইয়া গেল।

নায়েবের লাঠিঘালের দল সহজেই বাটার দখল পাইল, জোর  
ভবরদস্তির আদৌ প্রয়োজন হইল না।

( ২ )

ফুলের জীবন হরণ করিয়া বৃষ্টিচ্যুত করিয়া দিলেও তাহার নিস্তার  
নাই—কুড়াইয়া পুনরায় মালায় গাঁথিবার চেষ্টা করা হয়। মনোরমা  
প্রায়ঃ সন্ধ্যায় পুষ্করিণীতে ভল লইতে আসে। নিযুক্ত লোকমুখে  
সন্ধান পাईয়া স্বয়ং নায়েব মহাশয় তালপুকুরের বাঁধান ঘাটে আসিয়া  
অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রায়াক্ষকারে দূর হইতে মহামুষ্টি দেখিয়া  
মনোরমা একবার থমকাইয়া দাঁড়াইল। তারপর গায়ের কাপড়  
ভাল করিয়া গোছাইয়া লইয়া পুনরায় ঘাট অভিমুখে গেল।

“এই যে মনো।”

মনোরমা নায়েব মহাশয়ের আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ  
করিয়া কহিল, “নায়েব মশাই, তুচ্ছ স্বার্থের জন্য মানুষ মানুষকে  
এতটা পীড়ন করতে পারে! দুর্বলকে দলন করুবার জন্যই কি  
ভগবান ঐশ্বর্যশালীদের ক্ষমতা দিয়েছেন?”

## মনোরমা

নায়েব রসিকতা করিয়া কহিলেন, “অশানে শুয়ে তোদের এখনও যে আফালন কমেনি দেখছি।”

মনোরমা কহিল, “সত্যকথা বলতে কি কা’রো বাধা আছে?”

“যাক, এখন আছি কুঁকিয়া তোর।”

মনোরমা অধোবদনে কহিল, “আপাততঃ রামতারণ জেঠাদের বাড়ীতে,—তারপর দাদার একটা চাকরী ঠিক হ’য়ে গেলে আমার কলকাতায় গিয়ে থাকুবো।”

নায়েব মহাশয় বদন বিকৃত করিয়া কহিলেন, “কি বলিলি?—রাম তারণ বাড়ি যোর বাড়ী?” তারপর অধরে দস্ত চাপিয়া রামতারণ বাড়ি জোর উদ্দেশে কহিলেন, “হারামজাদা—পাজী বেটা,—জলে বাস করে কুমীরকে ভয় কর না?”

বস্তুতঃ রামতারণ বাড়ি যোর কোন দোষ ছিল না। স্বরেন হালদার জোর করিয়া সপরিবারে তথায় আশ্রয় লইয়াছে। তাই মনোরমা কহিল, “তাদের কোন দোষ নেই নায়েব মশাই।”

যে কথা সাধিতে আসা, কথায় কথায় তাহা হইতে বহুদূরে সরিয়া যাওয়া হইতেছে দেখিয়া, বর্তমানে দোষ-গুণের বিচার ত্যাগ করিয়া নায়েব মহাশয় মুহু হাসিয়া কহিলেন, “আচ্ছা মনো, সাধ ক’রে এ কষ্ট ভোগ করিতে তোদের ইচ্ছে হয়?”

“পরিভ্রমণের উপায়ও ত কিছু দেখি নায়েব মশাই।”

“উপায় যথেষ্ট আছে, আমার কথামত যদি তোরা চলতিস,

## অরণোত্তাস

তাহলে আজ এ দুঃখ তো তোদের ভোগ করতে হ'ত না,—রাজার হালে থাকতে পেতিস্ ।

মনোরমা উচ্চকণ্ঠে কহিল, “থাকতে পেতাম সত্য, কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, সে সৌভাগ্য যেন কখনও না হয় ।”

“ভাক্‌বি তবু মচ্‌কাবি না, কি বল ? খেতে না পেয়ে সব-  
গুলো একসঙ্গে ভড়িয়ে মরুবি, তবু খেচ্ছায় দিতে চাইলেও হাত  
পাত্‌বি না ।”

“ওতো খেচ্ছের দান নয় নায়েব মশাই, ও যে স্বার্থের দান,  
তা'ছাড়া দানে কখনও কা'রো দুঃখ ঘোচে না । নান্নুষকে স্থপ  
দিতে ঐশ্বৰ্য্যের ক্ষমতা নেই, স্বখে থাকবার ক্ষমতা মানুষকে করে  
দিতে হয় ।”

উপদেশ গ্রহণ করিতে নায়েব মহাশয় এ স্থানে আসেন নাই । যে  
কামনা তাঁহার মনোমধ্যে অহরহঃ জ্বলিতেছে তাহাকে শাস্ত করাই  
তাঁহার সৰ্ব্বাগ্রে প্রয়োজন । তাই ক্র-দ্বয় উপরে উঠাইয়া নায়েব  
মহাশয় কহিলেন, “এখনও ভাল কথা বলছি বুঝে চল, নইলে—”

“নইলে বাকী আরও কি আছে, নায়েব মশাই ।”

নায়েব মহাশয় নরম গলায় কহিলেন, “মনো, শোন,—তোকে  
আমি বড় ভালবাসি, তুই যদি নিজেকে মত করিস্, কা'রো সাধ্য  
নেই এতে বাধা দেয় । তা' ছাড়া আমি তো বলেই দিয়েছি, 'তোরা

## মনোরমা

বাপ যদি এতে রাজী হয়, আমি ন'পাড়ার দশ বিঘে জমী তোদের নামে লিখে দেবো।"

"দশ বিঘের দরকার নেই নায়েব মশাই, এগন আমরা যে না খেয়ে মরছি তার একটা বিহিত করুতে পারেন?"

"সব পারি, কিন্তু রাজি হ'বি বল?"

"যদি রাজি না হই তাহলে পারেন না? আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের মতন দশটা পরিবারকে ত প্রতিপালন করতে পারেন।"

"দশটা ছেড়ে বিশটা পারি, যদি আমার বুকটাকে তুই জুড়িয়ে দিতে পারিস।"

"তা ভিন্ন নয়?"

নায়েব মশাই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,—“না।”

সংসার এমনই কুটিল,—হাতে জিনিষ না পাইলে কখনই মূল্য দিতে চায় না। নিঃস্বার্থে দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, মমতা প্রদর্শনকে মানুষ অপব্যয় বলিয়াই মনে করে। ভগবান বাহাদিগকে নিকপায় করিয়া, অক্ষম করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে চিরকাল সহ্য করিয়াই যাইতে হইবে,—একটা মুখোমুখি কথা বলিবারও তাহাদের অধিকার নাই! আজ মনোরমার মাতা-পিতা-ভ্রাতা যদি সমগ্র গ্রামবাসীর চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া অনাহারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে, তথাপি নায়েবের ভয়ে হয়ত কেহই এক ফোঁটা মুখে জল দিতেও অগ্রসর হইবে না! দুর্বলের জাতি প্রত্যাশুর ক্ষমতাবানের



## অরণোত্তর

নিকট অগ্রাহ্য এবং দোষনীয় বলিয়া মনোরমা আর কথা কহিল না, বুকের জালা বুকে চাপিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

“কি চুপ ক’রে রইলি যে? ভট্টো মিষ্টি কথাও কি আমার সঙ্গে কইতে নেই?” বলিয়া নায়েব অগ্রসর হইয়া মনোরমার অঞ্চল ধরিবার উপক্রম করিতেই মনোরমা ঘড়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।”

সেইদিন হইতে মনোরমা আর ভল তুলিতে আসিল না।

( ৩ )

স্বজ্ঞের বোঝা যত বেশীকণ থাকে ততই ভার বোধ হয়।

রামতারণ ঝাঁড়ুঘোকে গৃহ-মধ্যে ডাকিয়া গৃহিণী কহিল, “বলি, পাপের বোঝা বিদেয় করবে কবে? আপদ ঢুকলো তো আর যে নড়তে চায় না।”

“আশ্রয়হীনকে চটুকরে ‘যাও’ বলি বা কেমন করে? শুন্‌লুম, বিপিন শীগ্‌গীরই কলকাতায় চাকরী করিতে যাচ্ছে; তাদের নিজেদেরও তো একটা মান-অপমান জ্ঞান আছে। একটা সংস্থান হয়ে গেলে পর ওরা আর কি এখানে থাকতে চাইবে?—আপনা ঠইতেই চলে যাবে।”

গৃহিণী গাভীৰ্য্য সহকারে থামিয়া থামিয়া কহিল, “অকচিতে অঞ্চল আর শীতে কঞ্চল কেউ কি সহজে ছাড়ে? আমি এত

## মনোরমা

অসৈরগ সটতে পারুবো না।” তারপর কর্তার মুখের নিকট হাত নাড়িয়া কিকিং কক্ষ উচ্চস্বরে কহিল, “তোমার কি বলনা, পুরুষ নাহুস্ব,—তোমায় ত আর কিছু স্তন্থে হয় না, পাঁচ জনের পাঁচ কথা স্তন্থে স্তন্থে আমার যে কান পচে উঠ্লে। তার উপর আশ্রয় দেওয়া তো নয়,—নিজের বিপদ নিজে টেনে আনা।”

বিনা পরিশ্রমে নিরন্তর মুখে অন্ন উঠা লোকচক্ষু সঙ্ক করিতে পারে না,—গাত্রদাহ উপস্থিত হইবে-ই। বারো বৎসর বয়সে বিববা হইয়া রাখারাগী কলিকাতার হাড়কাটা গলিতে কিছুদিন বাস করিবার পর নবদ্বীপ হইতে ‘ডেক’ লইয়া পুনরায় গ্রামে ফিরিয়াছে। সে এখন গ্রামের সকলেরই—‘বোষ্টম-মাসী’। বাঁড়ুঘো গৃহিণী তাহারই নিকট হইতে খবর পাইয়াছে,—মনোরমা জল আনিবার চলে প্রভাহ সন্ধ্যায় নায়েবের কাছারীতে যাতায়াত করে। একপ কুলটাকে গৃহস্থ সংসারে স্থান দেওয়ায় গ্রামের লোকেরা কেহই বাঁড়ুঘো বাড়ীর জল স্পর্শ করিবে না,—একথাও বলিয়াছে।

রামতারণ কিম্বৎকণ আপন পদস্বয়ের প্রতি নিস্তর্র ভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিবার পর মুখ তুলিয়া কহিল, “বিপদের আর এখন বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। নায়েব মশাই—বিচক্ষণ, গ্রামবান লোক,—তিনি কি কখনও কা’রো দুঃখ কষ্ট সহ্য কর্তে পারেন। আমাকে গোপনে ডেকে তিনি নিজেই বলে দিচ্ছেন, ওদের যেন বেশ যত্ন করে রাখা হয়।” নায়েব মশাই রামতারণকে একথা বলিয়াছিলেন

## মরণোন্নাস

সত্য কিন্তু কেবল স্বার্থোদ্দেশ্যে,—দূর গমনে মনোরমা ইত্তাশ্বরিত হইবার ভয়ে ।

গৃহিণী অধর উন্টাইয়া তাকিল্য ভাবে কহিল, “নায়েব কি তাদের খোরাকের জন্ত দশ বিঘে জমী লিখে দিয়েছে ?”

“না দিলেও নায়েবকে সন্তুষ্ট রাখাও যে আমাদের বিশেষ দরকার ।”

গৃহিণী কৃত্রিম ক্রন্দনের স্বরে কহিল, “বেশ, তবে ওদের নিয়েই থাক, আমি কালই গোবিন্দপুর চলে যাব ।” বলিয়া অভিমানাহতা রন্ধন গৃহে চলিয়া গেল ।

বৈকালে বোটম মাসী রসকলি কাটিতে কাটিতে মহামায়ার নিকট আসিয়া বসিল । ঠাডুয্যে গৃহিণী তখনও পাড়া বেড়াইয়া ফিরিয়া আসে নাই । মহামায়া জন্তে একখানি কাষ্ঠাসন অগ্রসর করিয়া দিয়া বোটম-মাসীকে বসিতে অনুরোধ করিল । বোটম-মাসী বাধা দিয়া কহিল, “থাক্, থাক্ মহামায়া, আমি বসবার জন্তে আসিনি ।”

গৃহচ্যুত হওয়া অবধি নিঃসঙ্গ থাকিয়া আজ বোটম-মাসীর অঘাতিত সম্ভাষণে মহামায়া আপনাকে কৃতার্থ/বাধ করিল । ‘বিষ-কুন্তঃ পয়োমুখম্’—বোটম-মাসীর স্বরূপ পূর্ব হইতে জানিয়াও মহামায়ার মন তাহার প্রতি কুভাব গ্রহণ করিতে পারিল না । বোটম-মাসী একবার চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কহিল, “আহা

## মনোরমা

বাছা, তোদের ডাং দেখে অবধি আমার বুকেটা কেটে যাচ্ছে। এখনও যে তোরা এ বাড়ীতে কি করে আছিস্, আমি তাই ভাবি।”

“কেন মাসী, এখানে আমাদের তো কোন কষ্ট হয়নি। ভগ-বানের রূপায় ঝাড়ুঘো মশাই ছিলেন তাই চারটিতে যা’ হোক ক’রে মাথা ঝুঁজে থাকতে পেয়েছি, নইলে কি অবস্থা হ’ত বল দেখি ? গাঁয়ের লোক ত মজা দেখতেই আছে, না খেয়ে পথে পড়ে মর থাকলেও কেউ কিরে তাকাতো না।”

বোষ্টম-মাসী নাক মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, “কিন্তু বাছা তোমাদের ঝাড়ুঘো গিল্মিও কম নয়। পথের লোক তবু পদে আছে, তাদের মুখে আর কাজে ভেদ নেই। কিন্তু এরকম মুখে ভালবাসা দেখিয়ে ভেতরে বিষের ছুরি কেউ চালাতে পারে না বাবা।—ছি, ছি।”

“কৈ, ঝাড়ুঘো দিদি তো তেমন নয় মাসী।”

“ওঃ আমার পোড়া কপাল ! তোরা লোক চিনুবি,—তাহলেই হয়েছে। পাকা কল খেতে মিষ্টি বটে, কিন্তু তাতেই পোকা ধরে।”

“কেন ঝাড়ুঘো দিদি কি কিছু বলেছে।”

ভ’একটা ঢোঁক গিলিয়া ‘হাঁ’, ‘না’ করিবার পর বোষ্টম-মাসী কহিল, “বৈরেগিনী মাহুষ হয়ে, মনে করি কারো কথায় থাকুবো

## মরণোন্মাস

না, কিন্তু বাছা, মহাপ্রভুর স্ৰীচরণাশ্রিতা হ'য়ে তাঁর জীবের দুঃখ কি  
চোখে দেখে থাকতে পারা যায় ?”

হায়, স্ৰীচৈতন্য ! তোমার জীব-প্রেম-প্লাবন আরও কতদূর  
পৌছিবে ।

মহামায়া উৎসুক নয়নে এই ভূমিকার সার অংশটুকু জানিবার  
জন্য বোষ্টম-মাসীর প্রতি চাহিয়া রহিল । রাখারাগী কহিতে লাগিল  
“বাড়্যে কৰ্ত্তা বাছা, তেমন নয়, গিঘিই কৰ্ত্তাকে ভেকে বল্লে,  
—‘যদি স্ববেন হালদারদের না ত্যাগন হয় তো সে জন্মের মত  
বাপের বাড়ী চলে যাবে ।’ মরতে মরু, যত কথা আমার কানেই  
পৌছয় ! হোদের না জানিয়েও থাকতে পারলাম না । দেগিস্  
ব'ছা, আমার নাম-টাম্ব বেন করিস্নে ।” এমন সময় বাড়্যে  
গৃহিনী একটা ছাঁচি কুমড়া ফোড়ে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিল ।

দূর হইতে গৃহিনীকে দেখিয়াই বোষ্টম-মাসী কৃত্রিম হাসির  
অভিনয় করিয়া কহিল, “এই যে মা-লক্ষ্মী আমার !—তোমার জগ্গেই  
বসে আছি । হাতে ওটা কি ?—কুম্ভো বুঝি ?—ঘোষেদের  
মাচার,—নয় ? তা বেশ, বাড়ি দেওয়া হচ্ছে কবে ?”

“আমার কথা আর বল কেন । লোকের বাড়ী গেলে কেউ কি  
আর ছাড়তে চায় ? চল, এক ফালি কুম্ভো নেবে চল ।”  
বলিয়া বোষ্টম মাসীকে ডাকিয়া বাড়্যে গৃহিনী বন্ধন গৃহ মধ্যে  
চলিয়া গেল ।

## মনোরমা

সন্ধ্যার পর স্বরেন হালদার স্ত্রীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রামতারণ বীড়ুয্যের নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, “দাদা, তোমার সংসারে অশান্তি হইল ক’রে আমি এখানে থাকিতে চাই না, আমাকে বিদায় দাও।”

রামতারণ বজ্রাহত হইয়া কহিল, “কেন,—কেন স্বরেন, কোথায় যাবে?”

স্বরেন হালদার উত্তর দিতে পারিল না; বালকের ন্যায় কাদিয়া উঠিল। রামতারণ অস্থমানে কতকটা কারণ বুঝিয়া লইল। তাব-পর কিছুক্ষণ অধোবদনে থাকিবার পর কহিল, “স্বরেন, গ্রাম সম্পর্কে ভাই হলেও তুমি এখন আমার অতিথি। অতিথির বেশে দরবারাও চলনা ক’রে গৃহস্থের আশ্রয় নেয়,—মানুষে তা জানুতে পারে না। ভগবানের আদেশ হ’লেও আমি তোমাদের শাড়াতে পারবো না।”

( ৪ )

বিকিণ্ড মন লইয়া মানুষ কোন কাব্যই সুসম্পন্ন করিতে পারে না। কলিকাতায় যাইয়া বিপিন দিন কতক অনাহারে অনিদ্রায় সওদাগরী অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে কোন দিনই তাহার সাহসে কুলাইল না। রাত্রে ফুটপাতে কিছা কোন পার্কে যখনই শয়ন করিতে যাইত, তখনই মাতা-পিতার

## মরণোন্মাস

ব্যথিত মুখ তাহার নয়ন সম্মুখে হুটুয়া উঠিত। অসীম চিন্তা তাহাকে একটু বিজ্ঞামেরও স্বযোগ দিত না। বিস্কক হৃদয়ে সে আবার দোকানে-দোকানে, গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে চাকরীর আশায় ছুটুয়া বেড়াইত। এমনি করিয়া একদিন সে পথিমধ্যে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়া অনর্গল রক্তবমন করিতে করিতে এম্বুলেন্সের মোটরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

গ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুল হইতে ‘বঙ্গবাসী’ আনিয়া রামতারণ পড়িয়া জানাইয়া দিল,—‘বিপিনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।’

স্বরেন হালদার, মহামায়া বা মনোরমা কেহই কাদিল না, তাহারা জানে,—মরিবার চক্কাই বিপিনকে কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল।

মনোরমা কহিল, “মা, আমি কলিকাতায় যাব।”

মহামায়া কণ্ঠকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “কেন মা?”

“চাকরীর জন্তে।”

স্বরেন হালদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, “তুই মেয়েছেলে, কোথায় চাকরী পাবি মা?”

মনোরমা ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল, “মেয়েরাও তো কলিকাতায় চাকরী করে।”

স্বরেন হালদার কহিল, “তারা লেখা-পড়া জানা মেয়ে, - লেখা-পড়ার-ই চাকরী করে।”

## মনোরমা

“তা হোক, লেখাপড়া না জানা বে চাকরী আছে, তাই আমি খুঁজে নেব।”

কন্ঠার পুরুষোচিত উজ্জ্বলিত মহামায়া ভীত হইয়া কহিল,  
“তুই যে পাড়ারগেয়ে গেরোস্তর মেয়ে,—একলা তাকে কেমন ক’রে  
চেড়ে দি বন ?”

মনোরমা জ্র-কুণ্ঠিত করিয়া কহিল, “পার না ? দাদাকে কেমন  
ক’রে চেড়ে দিয়েছিলে ? সেও ত তোমার পেটের ছেলে, আমিও  
তো তাই ! দাদা যখন ম’রে গেছে, তখন আমাকেই তোমরা  
বিপিন বলে ভেবে নিও।”

“কিন্তু তুই যে এখন বড় হয়েছিস্ মা।”

মনোরমা মুখে কাকণোর রেখা টানিয়া কহিল, “বড় হয়েছি ব’লেই  
তো আর তোমাদের অনাচার-ক্লিষ্ট মুখ সহ্য করিতে পারছি না।”

এমন সময় বোটম-মাসী আসিয়া কহিল, “কথা-ই তো, সেহুনা  
মেয়ে,—বাপ-মার কষ্ট কি চোখে দেখতে পারে ? আহা, গুর  
ঝরাই তোমাদের ডাঃখ ঘূচবে। কলকাতায় আবার চাকরীর  
অভাব ! সেখানকার ধুলো-মুঠো কুড়োলে সোনামুঠো হ’য়ে যায়।  
কিছু ভাবিস্নে মহামায়া, আমি মনোকে সঙ্গে ক’রে নিয়ে যাব।  
সেখানকার বড় বড় বাবুদের সঙ্গে আমার চেনা আছে।”

বাধারানীর অবাচিত সহায়ত্বভূতিতে মহামায়া দুর্ভেদ্য অন্ধকার  
মাঝে যেন একটু আলোক দেখিতে পাইল, কহিল, “জানতো মাসী,



## মরণোন্মাস

ও নাছোড়বান্দা মেয়ে ; যা বলবে তা' না ক'রে তো আর ছাড়বে না । তবু তুমি যদি যাও, আমি অনেকটা ভরসা পাব ।”

“ও যদি যেতেই চায়, আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে বৈকি । অচেনা জায়গায় একলা গিয়ে থাকবে কোথা ? বতই ঘাই হোক, গাছের মেয়ে, আমারো দেখা তো উচিত ?”

মহামায়া কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা মাসী, বন্ধুত্বায় মনোর কি কাজ হ'তে পারে ?’

“ভদ্রের ঘরের মেয়ে ভদ্রের কাজ করবে । বড় বড় বাবুদের বাড়ীতে কাজের চড়াছাড়ি . এমন মেয়ে পেলেন সব বহুত যাবে । অন্ধরে বসে কুটনো কুটবে, বাঁটনা বাঁটবে, ভাঁড়ার দেখবে,— পুরুষের সেখানে সম্পর্কও নেই ।”

অপরিচিত স্থানে বয়স্হা কষ্টাকে একাকী ছাড়িয়া দেওয়ার পরিবর্তে বোষ্টম-মাসীর হেপাজতকে মহামায়া অনেকটা নিরাপদ জ্ঞান করিল ।

কলিকাতায় আসিয়া রাখারানী আপনার বেশ-ভূষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিল । তারপর মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া একটা পরিচিত বাড়ির মতো প্রবেশ করিয়া ডাকিল, “বাউউলী মাসী কোথায় গো ?”

দ্বিতলের একটা জানালা হইতে জনৈকা খোঁচা রমণী মৃৎ বাউইয়া কহিল, “ওমা রাধি যে লো । আয়,—আয় —”

## মনোরমা

বাড়ীউলী মাসীর ঘরে প্রবেশ করিয়া মনোরমা দেখিল—গৃহীত আসবাবে পরিপূর্ণ। খাটের উপর একটা শুভ্র পরিষ্কার বিছানা এবং মেজেতে শুভ্র না হইলেও পরিষ্কার করিয়া আরও একটা বিছানা পাতা রহিয়াছে। মনোরমা পাশাপাশি দুইটা বিছানার তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারিল না। ঘরের কোনে কলিকা সমেত একটা গড়্‌গড়া বসান ছিল। মনোরমা তাহা দেখিয়া অসুস্থমান করিয়া লইল যে বাড়ীউলী মাসী তা'হলে বিধবা নয়,—বাড়ীও'লা মেসে। বলিয়া একজন নিশ্চয়ই আছে! প্রাচীর গাত্রে নানাবিধ উলঙ্গ রমণীর ছবি টাঙ্কান, তন্মধ্যে ত্রীগোরাঙ্গেরও একখানি ছবি শোভা পাইতেছে।

মনোরমাকে গৃহমধ্যে বসাইয়া বাহিরে বাড়ীউলী মাসীর সহিত রাধারাণী কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তা কহিল, মনোরমা তাহা শুনিতে পাইল না। তারপর রাধারাণী মনোরমার কাছে আসিয়া কহিল, “তুই এইখানে থাক, আমি একটু ঘুরে আসি। এর মধ্যে যদি কোন দরকার হয় ত বাড়ীউলি মাসীকে জানাস্।”

পল্লী-বালিকা মনোরমা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিল না যে সে কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। হতবুদ্ধির ভ্রায় কহিল, “এখনি ফিরবে তো?”

“ভাব্বার কিছু নেই,—শীগ'গিরই ফিরে আসছি।” বলিয়া রাধারাণী চলিয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না।

\* \* \* \* \*

## মরণোন্মত্ত

মাস দুই পরে একদিন সন্ধ্যায় মনোরমা ঢাকাই শাড়ী পরিয়া, পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া, মুখে পাউডার মাখিয়া, আপাদ-মস্তক কেমিকেল স্বর্ণের অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, হাড়কাটা গলির একটা দ্বারে দাঁড়াইয়া মাতাপিতার ভরণ-পোষণের অর্থের অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় জ্ঞানৈক ভহ্নলোক আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জান্নগা হবে ?”

প্রথম দর্শনেই মনোরমা আগন্তুককে চিনিয়া লইল, কিন্তু ভহ্নলোক মনোরমাকে চিনিতে পারিলেন না। মনোরমা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আপন ঘরে লইয়া গেল।

রাত্রি দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত বোতলের পব বোতল ‘ভইঙ্কি’ উড়িয়া গেল, কিন্তু মনোরমা একবিন্দুও স্পর্শ করিল না। আবক্ত শিবনেত্র ভহ্নলোক মনোরমাকে আপন পার্শ্বে আসিয়া বসিবার জন্ত উদ্বিগ্ন করিলেন, মনোরমা কটাক্ষপাত করিয়া দূরে সরিয়া গেল। ভহ্নলোক একবার ক্রুদ্ধ হইয়া মনোরমাকে গালাগালি করিলেন, পরক্ষণেই করকোড়ে মিনতি করিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিলেন, “দয়ানয়া, নিদয়া হ’য়ে না,—দয়া কর। তুমি না দয়া করলে এ চার জীবন আর আমি রাখ্বে না।”

“কোন্‌ দুঃখে ?”

“আমি তোমায় বড় ভাল বেসেছি—”

“এই একদিনে,—ক’ঘণ্টার মধ্যে এত ভালবেসে ফেলেন।”

## মনোরমা

“হাঁ, সত্যি বলছি,—মাইরি বলছি আমার সর্ব্বশ্ব নিয়ে শুধু একটাবার ক’রে রোজ আমায় দেখা দিও , আমি আর কিছু চাইনা, —একবার ক’রে শুধু চোখের দেখা—” বলিয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে পাঁচ হাজার টাকার একতাল্ডা নোট, ঘড়ির চেন, বোতাম, আংটা সমস্ত খুলিয়া মনোরমার সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ।

মনোরমা একবার পাগলের হাসি হাসিল , ভদ্রলোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন । মনোরমা গম্ভীর হইয়া কহিতে লাগিল, “নায়েব মশাই, জিনিষ হাতে না পেয়ে তো আপনি কখনও মূল্য দিতে চান্ নি !—তবে আজ অনিশ্চয়তার মাঝে স্বৈচ্ছায় সর্ব্বশ্ব দান কর্ত্ত বসেছেন যে । এ টাকা আপনি ফিরিয়ে নিনু,—এখন আর আমার কোন দরকার নেই । এ টাকা আর একদিন দিলে কিঞ্চি, তার পরিবর্ত্তে একটু সহানুভূতি পেলেও একটা সংসার এমন করে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতোনা,—একটা জীবন অকালে নষ্ট হ’তো না,—আমারও এ দশা কখন ঘটতো না । আমায় বোধ হয় এখন চিন্তে পেরেছেন ?—আমি সেই মনোরমা !”

## পৌষ-কালী

প'চ ছেলের বাপ পাঁচকড়ি চাটুজো পরজীর প্রতি অবৈধ  
অত্যাচারের অভিযোগ হতে খালস পেয়ে যখন তিনমাস পরে মকদ্দমা  
মিটিয়ে সহব থেকে গ্রামে ফিরে এল, তখন ব্রহ্মসুন্দরী ইঁপ ছেড়ে,  
চোখেব জলে বুক ভিজিয়ে বললে, “আঃ বাঁচলুম। পাড়ার নাচ  
বেটা-বেটার জালায় গাঁড়ে তেঁটান দায় হয়ে উঠেছিল। মরণ আব  
কি। দেবতার চরিত্তোরে কলক দেওয়া ত অমনি নয়,—মুখে সব  
পোকা পড়বে! আমি যদি সত্য-সাবিত্তিরি হই,—আমাব কথা  
ফলবেই বল্বে,—লেখে নিও!” তারপর স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে  
উঠাইয়া বহিল, “এত করে মা বালীর মানত কখনও কি বুঝা যায়।  
আমি জন্মভূমি,—মা মুখ তুলে চাইবেন-ই-চাইবেন, তিনি ভিন্ন  
আমাদের আর কে আছে? ওরে হারাণী, কোথা গেলি?—  
শীগ্গির দাঙ ময়রার লোকান থেকে নাচ-পয়সার বাতাসা এনে  
তুলসী-তলায় হরির-নোট দিয়ে দে!”

পাঁচকড়ি চাটুজো ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে একরূপ মামলায়  
অনেকবার-ই জড়িত হয়েছে, আজ মৃত্যু নয়। ছ’ বছর আগে  
সরকারী চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়ে গ্রামের মধ্যে-ই সে হাড়ি-

## পৌষকালী

বাগ্দীদের নিয়ে শ্যোরের ব্যবসা করে বেশ দু'পয়সা করেছে। তিনটে পাজা পুড়িয়ে গাঁয়ের বুকেব উপর তার যে পাকা ইমারত উঠেছে, আশে-পাশের দশটা গাঁ খুঁজলেও তেমনটা আর পাওয়া যাবে না।

ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে শূকরের ব্যবসা করার জন্ত দিন কতক বিছাবিনোদ খুড়ো অশ্রিমুগ্ধ হয়ে পাঁচকড়িকে 'একঘরে' করেছিলেন বটে, কিন্তু গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণের বিদ্যায়ে পাঁচসেরি সিনের সঙ্গে একটা করিয়া গিনি আছে খবর পাইয়া মুহূর্তেই রাগ জল করিয়া কহিয়াছিলেন, "পাঁচুর আমাদের অক্ষয় স্বর্গ হ'বে। আজকাল হিন্দুর ছেলেরা কিনা করছে। আর ও তো নিজের শ্যোর ঘাঁটেনা, সবই হাড়ি-বাগ্দীদের হাতে, এতে ওর দোষ কোনমতেই ধরা উচিত নয়।"

( ২ )

আট দশটা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে পিছনে করিয়া বাতাসার ঠোঙ্গা হাতে হারানী বাড়ী ঢুকিল।

ব্রহ্মস্কন্দরী তুলসীগঞ্জের উপর বাতাসার ঠোঙ্গা রাখিয়া মিনিট খানেক চক্ষু মুদ্রিয়া ধ্যান করিল, তারপর স্বামীর কপালে ঠেকাইয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' শব্দে হরির-লুট উঠানে ছড়াইয়া দিতেই ছেলেরা কাড়াকাড়ি-মারামারি করিয়া লুঠনে প্রবৃত্ত হইল।

## অরণোত্তাস

ব্রজসুন্দরী কহিল, “যাক্, হরির-নোটটা তো শেষ হল, এইবার মা-কালীর মানতটা দিয়ে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্দ হই।”

পাঁচকড়ি কহিল, “তুমি ত নিশ্চিন্দ হ’লে, কিন্তু আমাব যেচাং এখনও মেটেনি। মকদ্দমায় খালাস পেলুম বটে, কিন্তু কন্সলীব ছেলেটার খোরাক-পোষাক এখন বরাবর জুগিয়ে বেতে হবে। বাড়ের উপর আবাব একটা জোয়াল চাপ্নো।

“বুঝি, টাকা আদায়ের ফিকিরে-ই মাগী ঘুবুছেলো। মরণ আর কি। দিওনা, দিওনা।”

“তা কি হয়, এঘে হাকিমের হুকুম।”

ব্রজসুন্দরী কহিল, “তা যাক্, তুমি যে ভালোয় ভালোয় বর্ত্ত দিবে আসতে পেয়েছ,—এই ঢের! মামন্সীর বিরপায় ও মো পোষের ভঞ্জে কিছু আসে যাবে না। ধর্ম্মো বলে তো একটা জিনিস আছে, তার চোখে তো কেউ ধুলো দিতে পারবে না। কমন্স হারামজাদী ক’দিন রক্ত-ওঠা পয়সা ভোগ করুতে পার দেখে নেব।”

ধর্ম্মকথাব উত্থাপনে পাঁচকড়ি কিক্কাং বিরক্ত হইয়া কহিল, “ওসব ধর্ম্ম-টর্ম্ম আমার ভাল লাগে না। এ আমি সহজে ছাড়্ছি না, আবার বড আদালতে নালিশ করুবো।”

ব্রজসুন্দরী কহিল, “তা ক’রো, কিন্তু আগে কালীঘাটে মা’র মানতটা মিটিয়ে আসি চল,—নইলে মা’র কোপ-দিষ্টিতে আবাব কিছু অনখ ঘটবে।”

## পৌষকালী

“বা করবে, তা শীগ্গির শীগ্গির দেবে ফেল। আমাকে হয়ত দু’চার দিনের মধ্যেই তিনকড়ি উকিলের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হ’বে।”

“তা বেশ ত, এই সংকেরাস্ত্রির দিনই চলনা? পোষ-মাসে মাংস দেখার মত পুণ্য কি আর আছে। লোকে কথায় বলে,—বছরে বছরে পোষ-কালী একবার ক’রে দেখতে হয়। তা হলে সব জোগাড়-যন্ত্র করি,—কি বল?”

ইচ্ছা-অনিচ্ছা মিশ্রিত স্বরে “তা বেশ চল” বলিয়া পাঁচকড়ি শূকরের খোঁদাড অতিমুখে চলিয়া গেল।

পুরাতন দাসী হারাগী অন্তরাল হইতে স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপ-কথন শুনিতেছিল। এক্ষণে ব্রজহন্দরীর নিকট আসিয়া কহিল, “মাঠা’ন, আমায় যেন ফেলে যেওনি?”

ব্রজহন্দরী কহিল, “আ ময়, তুই আবার কোথা যাবি।”

হারাগী কহিল, “আমার যখন বেটা হইছিল, তেখন থেকেই আমি কালীঘাট মানত করছিলাম, মাঠা’ন, গরীব-গুড়বার পয়সার লেগেই হইয়ে উঠে না।”

ব্রজহন্দরী বিজ্ঞপ করিয়া কহিল, “কালে কালে হ’ল কি? বেটার জন্তে আবার কালীঘাটে মানত করা হয়েছিল,—মরে যাই। যাব বাপ-পিতেমোর ঠিক নেই, তার জন্তে আবার ঠাকুরের দোর



## মরণোল্লাস

ধরা। নাচ জাতের জালায় আর ঠাকুর-দেবতাও থাকবে না !  
ধুম্মো সব জলাঞ্জলি গেল ।”

বাহিরে সকলের নিকট অজ্ঞাত হইলেও হারাণীর নিকট ত্রিধরের প্রকৃত পিতার নাম অজ্ঞাত ছিল না। সে কহিল, “দোষ দিওনি মাঠান্, ইতি-জ্ঞাতে দোষ কইলেও ছিদিধর আনার দ্বয় কেমনে হ'বে ? চাবুরী লাগাত এঘর ছেড়ে তো কোথাও যাবার লাগিনি !”

দোষটা ঘরেরই প্রমাণ হইয়া যায় দেখিয়া ব্রজসুন্দরী কহিল, “আ ময়, ছোট জাতের একটা কণার বন্দনও নেই। যা মুখে আসে ফস্ করে বললেই হল ! খবরদার, আর এ বকন করে দেখা বলিস্ নি,—পাঁচজনে শুন্লে বলবে কি ?”

সত্য প্রকাশে কষ্ট ব্যবহারই নিলিয়া থাকে বলিয়া হারাণী সত্যকে ঢোক গিলিয়া কহিল, “তা যেতে দাও মাঠান্, কিন্তু আমাদের ফেলে যেওনি যেন ! অসুখে মাসের পাওনা একে না-বেটার যা খরচা লাগে কাইটে লিও ।”

ব্রজসুন্দরী কহিল, “ও সব হবে না, ছোট জাত নিয়ে গিয়ে সেখানে—ঠাকুর-দেবতার স্থানে কি আমি মুন্সিলে পড়াবা। আমি পারুব না।” বলিয়া ব্রজসুন্দরী অন্তত্ৰ চলিয়া গেল।

হারাণী আঘাত খাইয়া মনে মনে মা কালীকে স্মরণ করিয়া বলিল, “হেই মা, তোর কি একটু কিদুপা নেই মা। ছোট জাত

## পৌষকালী

বইলে কি তোর দেখাও মিলবেক না! ছোট জাতরা তোর ছিরি-চরণে কি দোষ কইয়েছে। যদি দেখাই দিবিক না, তো আমাদের জনম কেনে দিইলি।” বলিয়া হারাণী আপন মনে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া কহিল, “তুই এত পয়সা কেনে চিনুলি মা? কর্তাবাবুদের শ্রমের বিচা পয়সা আমাদের গতর-ভাঙ্গা পয়সা লেগে শুদ্ধ কি মা। পিখিবি-মা’র তো বাচ-বিচের নেই, সে তো সবারে কৈলে ধরে আছে।—তুই কেনে তেমন হইলি মা?”

হারাণীর চোখ পুনরায় ভলে ভরিয়া গেল। সে ডাবিল, শ্রীধর বখন কর্তাবাবুর ঔরস-জাত, তখন শ্রীধরের মঙ্গলকামনা কর্তাবাবু নিশ্চয়ই করিবেন। তাই সে কালীবাট দর্শনের প্রার্থনা লইয়া কর্তাবাবুর গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

পাঁচকড়ি তখন আগিলের চিন্তা করিতেছিল। হারাণীর ছ’একটা কথা শুনিয়াই ছঙ্কার দিয়া কহিল, “শীগগির দূর হয়ে বা ঘব পেকে।”

হারাণী তথাপি মিনতি করিয়া কহিল, “ছিরিধর আপনার কোত বটে। বেটাকে বাপ কি দয়া করুতেও পারে?”

পাঁচকড়ি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, “পাজী, হারাম-জাদি, ছোটলোক মাগী!—শ্রীধর আমার ছেলে! ওকথা আবার যদি কখনও মুখে আনবি তো জুতো ঘেরে বিদেয় করে দেব।”

## মরণোন্মত্ত

হামীর চীৎকারে ব্রজহৃন্দরী ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “আ মুখে আঙুল । আবার এখানে এসেও ছুটেছ ।”

পাঁচকড়ি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “এই দেখনা, হারামজাদী এখানে এসে বলছে—শ্রীধর আমার ছেলে, তাকে কালীঘাটে নিয়ে যেতে হ’বে ! ও পাগল হয়েছে,—নিশ্চয়-ই পাগল হয়েছে—”

ব্রজহৃন্দরী কথা চাপা দিয়া কোমরে হাত রাখিয়া কহিল, “মাগীর আশ্পদা তো কম নয় ! রূপের ছিরি তো একেবারে ঠিকরে পড়ছে ! তবু যদি একটু দেখবার মতো হতিস্, তাহলে না দ্বান আবণ্ড কত কথা বানিয়ে বানিয়ে বলাতস্ !”

উভয় পেথণে হারাগী হতবুদ্ধি হইয়া গেল । কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল,—কহিতে পারিল না । কেবলমাত্র অন্তরাল হইতে মন্দনদেব হাসিয়া কহিলেন “আমার পুত্রক কি সব সময় রূপ দেখে ।”

( ৩ )

পৌষ সংক্রান্তি ।

পাঁচকড়ি সজ্বীক কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা হইল । দশম বর্ষীয় পুত্র শ্রীধরকে কোলের নিকট টানিয়া হারাগী মাহুষের গড়া ব্যবধান বজায় রাখিবার জন্য শুভ দ্বাত্রার সম্মুখে না থাকিয়া দূর

## পৌষকালী

অস্তরাল হইতে সেই ক্ষয়-বিদারক দৃশ্য দেখিল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু বাহির হইল না ; কেবলমাত্র দুই ফোঁটা তল্ল অশ্রু শ্রীধরের মস্তকে পড়িল।

শ্রীধর মাতার আত্ম চক্ষু দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না , কহিল, “মা তুই যাবার লেগে কাঁদছিস ? আচ্ছা রোস্—” বলিয়া সে একদোড়ে বাটার বাহির হইয়া গেল এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “চল্ কোথায় যাবার চাস্ ?”

হারাগী পুত্রের চিবুক ধরিয়া কহিল, “কেমনে যাব ধন , সে বরাত কি কৈরে আইছি !”

শ্রীধর কোমর হইতে একটি গঁজিয়া থলিয়া জিনিসটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, “টাকার অভাব ভাবিস্ ?”

কাহারো অপহৃত টাকা ভাবিয়া হারাগী চুপি চুপি কহিল, “এতটাকা কেমনে পেলিরে ।”

পুত্র বুক ফুলাইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, “ভর করিস্ কেনে ? এ টাকা সব আমার। বাবুদের থ্যাটারে আমার পালা গাওনার লেগে বাবুরা মাঝে মাঝে আমায় যে টাকা দিইছিল, সে গুলো তোকে না দিইয়ে কল্কেতার সিগ্‌রেট আর তাম্বাক খাবার লেগে বিশে হুলের কাছে রাখছিলুম। এখন চাইয়ে আনলুম।”

মাতা পুত্রকে বৃকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বাবুবার চুষনে অভিষিক্ত করিয়া দিল। শ্রীধর কহিল, “আদর করবার সময় পরে

## অরণোত্তাস

ঢের পাবিক্। চল্। এই লাগাং টিকিট কিনে আমারও মাকে কালীঘাটে দেখ্‌বার যাই।”

হারাগীর তিরস্কারে না সত্যই অপমানিতা হইয়াছে তাবিয়া হারাগী মনে মনে প্রণাম করিয়া কহিল, “যা বৈলেছি তা অপরাধ হইছে, এবাব ক্ষেমা করিস্ না।”

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান হইলেও ত্রীধর সাহসে বুক বাধিয়া, মাতাকে লইয়া প্রভু এবং প্রভুপত্নীর অলক্ষিতে তাহাদের সহিত একই টেণে চাপিয়া বসিল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া হারাগী দূবে মাঠা’ন্ ও বাবাঠাকুরকে দেখিয়া ত্রীধরের হাত ধরিয়া তাহাদের লুকাইয়া চলিতেছে, এমন সময় ‘হৈ’ ‘হৈ’ শব্দে কোলাহল করিয়া রাস্তার লোক দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া হারাগী একবার ভাবিল, দৌড়িয়া গিয়া কর্তাবাবু শরণাপন্ন হয়; কিন্তু মুখ তুলিয়া দেখিল,—কর্তাবাবু এবং মাঠা’ন্ উভয়েই জনৈক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

হারাগী পুত্রকে বন্ধের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কানিয়া উঠিল। একজন শিখ ট্যান্ডিওয়ালা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আপন মোটরে উঠাইয়া লইয়া কহিল, “কুহ্‌ ডব্‌ নেই মাঈ। আপ্‌ কাঠা যাইয়েগা।”

## পৌরবানী

হারানী কহিল, “কালীঘাট ।”

শিখ কহিল, “আজি কালীঘাটে বহুত দাঙ্গা চলুতা হ্যার ;  
উধার মাং বাইয়ে মাট্ট । কোই বাঙ্গালীবাবুকা কোঠীমে চলিয়ে,  
উবার উতার দেই ?” বলিয়া শিখ উর্দ্ধ্বাসে মোটর চালাইয়া  
জটনৈক বাঙ্গালী গৃহস্থের বাটীতে তাহাদিগকে নামাইয়া দিল ।

বাটীর গৃহিণী অসহায় বালক ও রমণীকে দেখিয়া সযত্নে উপরে  
লইয়া গেলেন ।

\* \* \* \* \*

দাঙ্গা থামিয়া গিয়াছে ।

স্বর্গীয় মায়ার আকর্ষণকে ছিন্ন করিয়া আসিতে জ্ঞানী-অজ্ঞানী  
কেহই পারে না ! হারানীও পারে নাই ।

গৃহিণী কহিলেন, “দেখ, হারানী, তুই আর জন্মে নিশ্চয়ই  
আমার কেউ ছিলি । তা’ নইলে তুই আমার কাছেই বা এসে  
পড়ুবি কেন, আর আমি-ই বা তোকে ছাড়তে পারছি না কেন !”

হারানী কহিল, “আমার মনে লাগে, আর জন্মে আমি আপনার  
বেটী ছিলাম ।”

নিভৃতে বসিয়া গৃহিণী হারানীর আজন্ম দুঃখের ইতিহাস প্রায়ই  
তাহার নিকট হইতে শুনিতেন এবং ভগবানের বিরুদ্ধতা করিয়া  
মাশ্ব মাশ্বকে কেমন করিয়া দূরে সরাইয়া রাখে, তাহাই  
ভাবিতেন ।

## অরণোদ্যাস

মাতাকে একলা পাইয়া একদিন শ্রীধর হারাগীকে কহিল, “মা, যে লেগে কল্‌কাতা আইলি, সে কথা বেবাক্ হজম কইরে দিলি।”

হারাগীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সেই জলভরা চোখে একমুখ হাসিয়া হারাগী পুত্রকে গৃহিণীর নিকট আনিয়া কহিল, “তুই কি চোখের মাথা খাইছিস্! পোষ-সংকেয়াস্তির দিন ই তো আমরা চৈতন্য আনন্দময়ীর দেখা পাইলাম। লে দয়াময়ী মায়ে পায়ের ধুলে লিয়ে আবার মাথায় দে।” বলিয়া পুত্রকে গৃহিণীর নিকট অগ্রসব করাইয়া দিল।

টিক সেই মুহূর্তে পাশের বাড়ীর ছেলে চীৎকার করিয়া বিছালদেহের পড়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল, “মহাত্মা টলষ্টয় বলিয়া গিয়াছেন,—মিথ্যাকে কখনও মর্যাদা দিও না, পৃথিবীতে মানুষ-ই ভগবান।”

## ‘দেশের’ টান

ছেলেবেলা হইতেই আমাকে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, অথচ বংশের অধুনা একমাত্র ছালা, মাভহারি,—কলিতেও কেহ পারিত না। কিন্তু একজন ছিলেন, বিনি দোষে-গুণে আমাকে সমভাবেই দেখিতেন;—তিনি আমার ঠাকুর-মা।

আমার জালাতনের বোনাঝালে আমাদের বাড়ী থেকে গ্রামের ছলে-বাগ্মী পযান্ত সকলকে-ই একবার-না—একবার পড়তে হয়েছে, নিকৃতি কেউ যে কখনও পেয়েছিল বলে মনে হয় না। বিববা পিসিমা পঞ্চপাত্র সামনে রেখে প্রত্যহ-ই চক্ষু মুদ্রে যোগাসনে আঁজিক করিতে বসতেন, আর আঁজিক সমাপনান্তে চোখ খুলে দেখতেন যে পঞ্চপাত্রটা পাতকো-তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। অমনি আমার ডাক পড়ত। আমি বলতুম, যত কি আমারই পোষ! আমি ছাড়া কাক, ইঁদুর, কাঠ-বেড়ালী বুঝি আর কিছুই বাড়ীতে নেই। সেই মুহূর্তে ঠাকুরমা আসিয়া “বটে-ই ত” বলিয়া ফোন হইতে সরাইয়া লইয়া বাইতেন। পরদিন থেকে পিসিমা একহাতে পঞ্চপাত্রটা ধরে ধ্যান করতেন!

বাবাকে প্রকাশ্যে খুবই ভয় করতুম, কিন্তু তাঁর আসাকাত্তে তাঁর ক্যাস-বাল্লে নকল চাৰি লাগাতে ও তাঁর সন্ত-পীত হাঁকোটার



## অন্নপোস্তাস

মুখ দিতেও ছাড়তুম না। গ্রাম বাসীরা যে বাগানটায় কাঁটার বেড়া দিত, সেই বাগানটার উপরই আমার নজর পড়তো বেলা। আমার প্রতি দুটো প্রাণখুলে গালাগালি দিয়েও তারা তাদের কতিপূরণ করতে সাহস করত না,—কেননা আমি জমিদার-পুত্র! অধিবস্ত ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মশাপ। বাড়ীতে যখন সকলে একান্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতো, তখন তাঁরা আমায় না বকেও থাকতে পারতেন না, কিন্তু লাগাম টেনে,—ঠাকুর ভয়ে!

উপনয়ন সংস্কারান্তে বাবা আমায় গ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করবার মনস্থ করলেন। কিন্তু জন্মাবধি দিবারাত্র পল্লীর উন্মুক্ত বাতাসে ছুটাছুটি করিয়া কাটানোর পর কেমন ক'রে সেই রুদ্ধ টিনের অন্ধকূপের মধ্যে কাটাবো স্বরণ ক'রে আগে থেকেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। নিরুপায়ের উপায় ঠাকুর'মার কাছে গিয়ে আমি কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলুম। ঠাকুর'মা বাবাকে ডেকে বললেন, “এ তোমার বড় অগ্রায় বাছা। ছেলের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাকে জোর করে কখনও লেখা পড়া শেখান দায়। আর, এই বয়সেই ওকে অতটা পীড়ন করলে চলবে কেন? বেঁচে থাকলে ও আপনা হতেই ঘটকর্পর, কালিদাস-বরকচির পাশে আসন করে নেবে!” বাবা গম্ভীর ভাবে “আচ্ছা বেশ” বলে চলে গেলেন। আমি এতক্ষণ বাবার উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎকর্ষ হ'য়ে জানলার পিছনে লুকিয়ে ছিলাম। বাবা চলে যেতেই

## ‘দেশের’ টাল

ছুটে এসে ঠাকু’মার গলা জড়িয়ে ধরে খানিকটা হেসে হাঁপ ছেড়ে বাচলুম।

আমাদের বাড়ী দেবগ্রাম, চল্টি কথায় লোকে ‘দে-গাঁ’ বলে থাকে। বর্দ্ধমান ষ্টেশন থেকে প্রায় ১৪ মাইল পথ। বর্দ্ধমান সহরে লাট আশুবে শুনে একবার মাত্র আমি আমাদের গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলুম; তাও চোন্দ বছর যয়সে। বাড়ীতে, আমার এক মামা ছিলেন, তিনি-ই ভুলিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে যাহোক ক’রে আমায় ‘আখ্যান-মঞ্জরী’ আর ‘কিং-রিভারে’র খানিকটা খানিকটা পড়িয়েছিলেন।

হাঁ, একটা আমার গর্কের আর লাভের কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি বোমার মামলায় গড়ে যাবজ্জীবন দীপান্তরে বাস করুছেন। আমি তাঁর ভ্রাতা, অতএব এখনকার যুগে আমি দেশের গর্কের সামগ্রী এবং লাভ,— দাদার যাবজ্জীবন দীপান্তরে আমিই পিতার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

দিনগুলো আমার বেশ কাটছিল। তঠাং একদিন ভোর বেলা দেখি আমাদের বাড়ীর চতুর্দিক সহরের পুলিশ ঘেরাও করেছে। খবর পেলুম, কোথায় নাকি রেল-লাইন খুলে কা’রা ট্রেন উন্টাবার চেষ্টা করেছিল, তাই দিকে-দিকে পুলিশ তদন্তে ববিরিয়েছে। ঘণ্টা-তিনেক সারা গাঁ-টা খানাতল্লাসের পর সন্ধ্য

## অরগোল্লাস

জনক কিছু না পেয়ে তারা তো চলে গেল। কিন্তু বাবা ভয়ে সারাদিন একবিন্দু জলগ্রহণও করেন নি।

এই রকম নিরক্ষর, নিকর্যা হয়ে নিরর্থক ঘুরে ঘুরে বেড়ালে আমার প্রতি ও পুলিশের দৃষ্টি পড়তে পারে ভেবে বাবা আমার আশ্রমে ছুঁলে ঢোকাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঠাকু'মা বেঁচে থাকতে সে চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে গোপনে আমাকে অস্ত্র বোডিংএ পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল।

আমার কাছে সে কথা বেনীকশ গোপন রইল না। জানতে পারলুম, আমার নির্বাসন স্থান—কলকাতা। আজব সহর হ'লেও অস্ত্রাস্ত্র পাভাগেয়ে ছেলেদের মত কলকাতা দেখবার লখ আমার মোটে-ই হ'ত না বরং ভয়ের সঞ্চার হ'ত।

বাই হোক, যাবার দিন কেমন করে এ খবর ঠাকু'মা জানতে পেরে গরুর গাড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আমিও থাকতে পারলুম না, কাঁদতে আরম্ভ করলুম। অশ্রু-সিক্ত ঝাপসা চোখে দেখতে পেলুম,—আবালা-শুভি-ভড়িত গ্রামের সমস্ত গাছপালা, ক্ষেত-খামার, বারোয়ারীতলা, পুকুরঘাট, সবই যেন আমার সাথে সাথে কাঁদতে লেগেছে। কিন্তু বাবার কটাক্ষের কাছে তা'দের তীব্র আকর্ষণ মুহূর্তে শিথিল হ'য়ে গেল। ঠাকু'মাকে জানি না আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আমার গাড়ী ক্ষেতের উপর দিয়ে টেননের পথ ধরলো।

## ‘দেশের’ টান

বোডিংএ দিন কতক বেশ শান্তশিষ্ট ভাবেই লেখাপড়া করলুম। তাদের কম্পাউণ্ডের বাইরে আমি আরো যেতে পেতুম না। আহা, নিদ্রা, স্বপ্ন, ভ্রমণ সবই তার ভিতরে। এক-একদিন প্রাণটা ভরানক হাঁপিয়ে উঠতো। মন যখন ‘দেশের’ স্ববিজ্ঞত মাঠের কথা মাঝে মাঝে তুলতো, তখন তাকে অনেক ক’রে বোঝাবার চেষ্টা করতুম যে, এই বোডিং-কম্পাউণ্ডই তোর সেই মাঠ—আজ সংকীর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু মন তা’ বুঝতে চাইতো না। বাবার জন্ম আমার ততটা কষ্ট হ’ত না, কিন্তু ঠাকু’মার অভাব আমি বিশেষ ক’রেই বোধ করতুম, কেননা বাড়ীর মতই তিরস্কার এখানে ভোগ করতে হ’ত, কিন্তু জুড়াবার জন্ম ঠাকু’মাকে পেতুম না।

দিন কয়েকের মধ্যে-ই শিক্ষকেরা আমার গ্রাম্য অসভ্যতা কে সভ্য করিয়েছিলেন, চরিত্রকে নিষ্পলক করিয়ে তুলেছিলেন, ব্যবহারকে শিষ্ট করিয়েছিলেন, বুদ্ধিকে উন্নত করিয়ে ছিলেন, কিন্তু সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে আমার অগোচর দুঃস্বপ্ন মনকে তাঁরা শাসন করতে পারেন নি!

একদিন ক্লাশের একজন ছেলের কাছে খবর পেলাম যে, ‘কংগ্রেস আফিসে’ কোথাকার সভাপ্রবন্ধের জন্ম স্বেচ্ছা-সেবক নেওয়া হচ্ছে। কথাটা শুনে-ই মাথাটা একটু বিগড়ে গেল। পরদিন রাতে কম্পাউণ্ডের পাটল টপ্‌কিয়ে খোঁজ নিয়ে ‘কংগ্রেস অফিসে’ গিরে

## অরণ্যোদ্যান

নাম লিখিয়ে বেখানে সত্যাগ্রহ হচ্ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে দু'চারদিন লোকের বাড়ী বাড়ী বেশ খাওয়া-দাওয়া গেল। তারপর একদিন একটা দলের সঙ্গে আমার-ও পুলিশ কোর্টে টেনে নিয়ে গেল। বিচারে দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তিন মাসের জন্তু আমায় কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হ'ল।

জেল থেকে কলকাতায় ফিরে দু'দিন 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করবার পর বাবাকে টাকার জন্তু চিঠি লিখলুম। বাবা টাকা পাঠালেন না, কিন্তু চিঠির উত্তর দিলেন, "কুলাঙ্কর, তুমি আমার ত্যজ্য-পুত্র। আর তোমার মুখদর্শন করুতে চাইনা, টাকাও পাঠাতে পারুবো না।"

মনটা ভয়ানক দমে গেল। চোখ ফেটে জল বা'র হয়ে এল। ছেলে যতই দোষী হোক, তথাপি তাকে অনাহারে মরুতে দেওয়া কি বাপের কর্তব্য! ঠাকু'মা বেটিও কি মরে গেছে। সে কি আমার কথা শোনেনি!—নিশ্চয়-ই শুনেছে! প্রচণ্ড রাগে সর্ব-শরীর কেঁপে উঠলো, প্রতিজ্ঞা করলুম,—এ জীবনে আমিও আমার আপনার লোকের আর মুখ দেখুবো না, দে-গাঁয়ের দিকে ফিরেও তাকাবনা—স্বাবলম্বী হ'ব। কৌচার খুঁটে চোখ মুছে মনকে শাস্ত ক'রে জানিয়ে দিলুম, যে, জগতে তুই একা, তোর আপনার জনও কেউ নেই,—তোর স্থানও নেই। সবই তোকে বাইরে থেকে নিজে খুঁজে নিতে হ'বে।

## ‘দেশের’ টান

একটা মেসে ১০ টাকা খোরাকী আর ৪ টাকা ‘সিটু’ ভাড়া দিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে খবরের কাগজ বেচে আমার দিনগুলো একরকম কাটতে লাগলো। গ্রামের একটা লোক কল্কাতায় এসে গোপনে আমার এই অবস্থা দেখে গিয়ে ঠাকু’মাকে খবর দিয়েছিল। তার ছ’টার দিনের মধ্যেই একদিন ঠাকু’মা খোঁজ ক’রে ক’রে আমার মেসে এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখেই আমার আপাদ-মস্তক জলে উঠলো। মেসের ঝিকে দিয়ে পাগল বানিয়ে তখনি তাঁকে দূর ক’রে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলাম। পরে ঝিকে জিজ্ঞেস ক’রে জেনেছিলুম যে, যাবার সময় ঠাকু’মা নাকি খুব কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছিলেন।

হুর্গাপুজার ছুটিতে কাগজ বন্ধর দরুন চারদিন রেহাই পেয়ে আমার সহকর্মীরা ঠিক করলে মধুপুর যাওয়া হ’বে। আমি প্রথমটা রাজী হ’লুম না। মনে মনে ভাবলুম,—মধুপুরের পথে যে বর্জমান ষ্টেশন পড়বে। না, কখন-ই যাওয়া হ’তে পারেনা। পূর্বকথা স্মরণ করে রাগে আমার গা গরম হ’য়ে উঠলো। তাদেরকে শুধু বললুম,—আমার যাওয়া হ’বে না। তারা কিন্তু কোনমতে-ই ছাড়লেনা; ‘এক যাত্রায় পৃথক ফল’ আউড়ে যখন তারা আমায় নিতান্ত চেপে ধরলে, তখন বাধ্য হ’য়ে আমাকেও বিছানা বাঁধতে হ’ল। মনে স্থির করে রাখলুম যে, বর্জমানের কাছটা চোখ বুঁজে থাকুবো,—চোখেও আর বর্জমান জেলাটার কোন অংশ দেখুবো না।

## সরগোল্লাস

( ৩ )

রাত্রি আটটা। গাড়ী ছাড়তে তখনও আধঘণ্টা দেবী।  
টিকিট কিনে গাড়ীতে বসে সকলে তাস খেলতে আরম্ভ করলে।  
আমি তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে পারলুম না, বিমনা হ'য়ে  
বইলুম। অনেকের অনেক রকম ঠাট্টা-বিক্রপ শ্রব করলুম।  
তারপর বিছানা পেতে পকেট থেকে খানিকটা সিগিরাটা বা'র করে  
মুখে পুরে গভীর নিদ্রার আরাধনা করতে লাগলুম। বলা বাহুল্য,  
সিগিরি রূপা আমার প্রতি নীত্বই হ'য়েছিল, কেননা কখন গাড়ী  
ছেড়েছিলো তা আমি একেবারেই অনুভব করতে পারিনি।

'বর্দ্ধমা-আ-আ-ন !' 'বর্দ্ধমা-আ-আ-ন !' কুলীর চীংকারে আর  
গাড়ী খামার ঝাঁকানিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জোর ক'রে  
চোখ বন্ধ করে রইলুম, কিন্তু চোখ না দেখলেও আমার মন দেখতে  
পাচ্ছিল—ঐ যে ওভার-ব্রিজ,—কাটোয়ার রাস্তা ! ঐ যে বাড়ীর  
চিলের ছাটটা। ঐ যে তাল পুকুর—বারোয়ারীতলা ! ঐ যে বকুল-  
গাছটা—ফুল বাড়ী। ঐ যে বাবা ! ঐ যে আমার ঠাকু'মা ! না  
আর থাকতে পারিনা,—ঐ যে সকলে আমার দিকে চেয়ে আছে !

মস্ত-মুগ্ধের মত কখন যে আমি গাড়ী থেকে প্লাট-ফরমে নেমে  
পড়েছিলুম তা জানি না ; সহযাত্রী বন্ধুরা তাড়াতাড়ি এসে আমাকে  
ধবুতেই আমার চেতনা হ'ল। আমাকে তারা গাড়ীতে উঠতে

## ‘দেশের’ টান

বল্লে, আমি ছোট ছেলের মত চীৎকার করে কেঁদে বললুম,—  
আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাবনা।

আমার ইতিহাস না জানার দরুণ তারা আমার অবস্থা ঠিক  
বুঝতে পারলেনা, ভাব্লে, আমি পাগল হয়ে গেছি! জোর  
ক’রে যখন তারা সবাই মিলে আমাকে গাড়ীতে তুলে আনলে,  
তখন আমি সত্যিই পাগলের মত মার-পিট আরম্ভ করলুম। তারা  
ভয়ে ছেড়ে দিতেই আমি গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে কার্টোয়ার পথ  
ধরলুম।

\* \* \* \*

তখন রাত্রি দুইটা।

পাগলের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীর দরজার সামনে এসে  
থম্কে গেলুম। দেখলুম, একটা বাঁশের ঝাটিয়া বাঁধা পড়ে রয়েছে,  
আর বাবা ও অস্ত্রান্ত সকলে মিলে ধরাধরি করে ঠাকুঁমার  
মৃতদেহটা বাইরে নিয়ে আসছেন।



## পথরোধ

“মা-লে খেতে দিবি না ?”

“পোড়ার-মুখো ছেলে কোথাকার, দিন-রাত্তির খেতে দিবি না আর খেতে দিবি না,—মুখে আর অস্ত্র বাক্য নেই !”

“তুই পোলাল-মুখো,—থাতু-মা কে বলে দোব ।”

“আদরের নাতি হয়েছিল, যা তোর ঠাকু’মার কাছে যা,—সোহাগ করে গেলাবে এখন” বলিয়া কুসুম-কুমারী দেড় বৎসর বয়স্ক পুত্রের মস্তকটী নাড়িয়া ঠেলিয়া দিয়া স্বামীর পানের কোটা মধ্যে পান ভরিতে লাগিল। পুত্র চীৎকার করিয়া কাদিতে আরম্ভ করিল।

ক্রন্দনের রোল ক্রমান্বয়ে উচ্চে উঠিতেছে দেখিয়া কুসুমকুমারী পুত্রের মুখের উপর হস্ত-প্রদানান্তর কহিল, “হারামজাদা ছেলে চুপ্-কবুরে বাবা চুপ্-কবু ! রাঙ্কসী মাগী শুভে পেলে আমার আর আন্ত রাধ্বে না ! একে ত বলে পুড়ে মলুম, তার উপর তুই ও এরকম ক’রে জালাস্ যদি তা’হলে আর বেঁচে লাভ কি ।”

মাতা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর

## পথরোধ

চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল। সে চীৎকারের অর্থ—পিতামহীর কর্ণে বাহাতে ক্রন্দনের সুরটা পৌঁছিতে পারে।

কুসুম-কুমারী বিরক্ত হইয়া আপন মনে কপাল চাপড়াইয়া কহিল, “পোড়া কপালীদের আবার ছেলে হতুকে স্বথ হবে!—তা হলেই হয়েছে! পেটের ছেলের মত শত্রু আর কি ভিত্ত্বনে আছে! পোড়া-মানুষের পেটে ভগবানু ছেলে কেন দেয় গো!—আঁটকুড়িদের গায়ের বাতাস লাগলেও পুণ্যি আছে!”

কুসুম-কুমারী বাহা ভাবিল, তাহাই ঘটিল। গো শালা হইতে কোমরে আঁচল জড়াইয়া কর্ণিত-কেশা স্বত্র-ঠাকুরাণী গোময় লেপিত হস্তে হনু হনু করিয়া আসিয়া পৌত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে বাহু!—কে ঘেরেছে ধন?”

ঠাকুর মাকে দেখিয়া বাহুর ক্রন্দন নিমেষে থামিয়া গেল। সজল চক্ষে গম্ভীর মুখে কুসুম-কুমারীর প্রতি অস্থূলি নির্দেশ করিয়া কহিল, “মা।”

পৌত্র-মুখ হইতে ‘মা’ কথাটি শুনিবার ক্ষণ ঠাকুর মা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। কহিলেন, “বলি, হ্যাঁগা বউ, তোমার আঁকেলটা কি রকম শুনি? ছেলের গায়ে হাত তোল কেমন করে! ছেলের গায়ে হাত তুলতে তোমায় বারবার মানা ক’রে দিয়েছি-না?—আবার সেই কাজ! খবরদার বলছি, আর কখনও ছেলের গায়ে হাত তুলো না!—জাননা, ছেলেই হচ্ছে স্বয়ং নারায়ণ।”

## অরণোক্তাস

মাতাকে তিরস্কৃত করিতে পারিয়াছে দেখিয়া মনে মনে  
নিরতিশয় আফ্লাদিত হইয়া শিশু সজল-নয়নে, স-হাস্ত বদনে কহিল,  
“ধাতু-মা তোলে—”

“এস ধন আমার এস” বলিয়া গোময় লেপিত হস্তে সাবধানে  
পৌত্রকে ফ্রোড়ে উঠাইয়া ঠাহর-মা চলিয়া গেলেন।

( ২ )

“মুখটা আজ অমন ভারি ভারি যে ”

“হু” বলিয়া একটা ছোট উত্তর দিয়া শচীন্দ্রনাথ নিজীবের  
মত ঘরের এক কোণে বসিয়া পড়িল।

জমিদারের কাছারী-বাড়ী তাঁহার বসত-বাড়ীর সহিত সংলগ্ন।  
শচীন্দ্রনাথ সেইখানে হিসাব-নবিশী করে। মধ্যাহ্নে কার্য্যান্তে  
বাটীতে কিরিয়া শচীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে তরুণী পত্নী কুম্বমের সহিত  
কিয়ৎকণ রসালাপ করিবার পর স্নানাহার করিতে যায়। আজ  
তাঁহার ব্যতিক্রম ঘটায় কুম্বম-কুমারী আশ্চর্য্যাবিতা হইয়া স্বামীর  
সম্মুখে উপবেশন করিয়া কহিল, “কি হয়েছে খুলে বল না। আমার  
বুঝি শুন্তে নেই।”

“যাও, যাও এখন, পরে বলবো।” বলিয়া শচীন্দ্রনাথ দুই  
হাঁটুর মধ্যে মাথা ডুজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

## পথরোধ

কুসুম-কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, “বেলা বে পড়ে এল—খাওয়া দাওয়া করবে না ?”

“ভাত হ’য়ে থাকে যদি দু’টী এনে দাও ।”

“চান্ করবেনা ?”

“না, আজ আর চান করবো না—ভাত নিয়ে এস ।”

আহারের পূর্বে আর কোন কথা উত্থাপন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কুসুম-কুমারী ভাত আনিয়া দিল ।

শচীন্দ্রনাথ দুই-এক গ্রাস ভাত মুখে উঠাইয়াই কহিল, “আর ভাত খেতে পারবো না, থালা নিয়ে যাও ।”

“কেন,—ভাত খাবেনা কেন ।”

“শরীরটা তত ভাল বোধ করছি না—খুব সম্ভব জ্বর এসেছে ।”

“এই ত সবে পাঁচ-সাত দিন ভাত খেয়েছ—আবার জ্বর !”

“জ্বরের দোষ কিছু নেই” বলিয়া শচীন্দ্রনাথ শয়ন করিবার জন্য কুসুম-কুমারীকে মাহুর পাতিয়া দিতে আদেশ করিল । কুসুম-কুমারী মাহুর পাতিয়া স্বামীর কপালে হাতদিয়া গরম অহুভব করিয়া কহিল, “ওঃ ! তোমার গা বে ভয়ানক গরম ! বোগীন্ কব্ রেজকে খবর পাঠাই—কি বল ।”

শচীন্দ্রনাথ হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল । কহিল, “আর কব্ রেজ !—দু’দিন বাদে খাবার পয়সা কোথা থেকে জোটাবে তাই ভাব ।”

## মরণোন্মাদ

কুহুম-কুমারী তাডাতাড়ি কহিল, “মাগো!—অমন অলঙ্ঘণে  
কথা শুধু শুধু বলছ কেন?”

শটীক্ষনাথ রক্ত-চক্ষুদ্বয় বাহির করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, “শুধু  
শুধু নয় কুহুম, —শুধু শুধু নয়। নিজেদের হু’এক বিঘে জমি থাকত  
—চাকরীর তোয়াক্কা করতুম না। যাক্, জমিদারের চাকরী গেছে  
—আপদ গেছে।”

“আবার জমিদারের সঙ্গে কি গোলযোগ ক’রে এলে। তুমি  
বাপু বড় একগুঁয়ে লোক! জমিদার ভিন্ন যখন আমাদের একদণ্ড  
চলবে না, তখন তাঁর সঙ্গে রেবারেঘি ক’রে কি লাভ! আর তিনি  
হলেন মনিব—একরকম গাঁয়ের মাথা।”

“মনিব কে ক’র কুহুম! ভগবান কাউকে কখন মনিব ভূত্য  
তৈবী করে পাঠান নি! মহাব্যয় বিকাশের জন্তাই মাহুঘের জন্ম।  
মাহুঘ অক্ষম হ’য়ে পৃথিবীতে আসে বটে, কিন্তু অক্ষমতাতেই তার  
পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত নয়। সুদীর্ঘ-জীবন-যাত্রার মধ্যে তাকে  
বিচিত্র দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে যুদ্ধ ক’রে ত’র দাবী আদায় করে  
নিতে হয়। নিজেকে নিজের ভেতর ঢাকা দিয়ে রাখতে যে  
চায়—তার বনে বাস করাই ভাল।”

“তা হলেও, পাঁচজনে যখন খাতির করে মেনে চলছে, তখন  
তোমার একলার অত মাথা ব্যথা কেন?”

“পাঁচজনেই ত সর্বনাশ করেছে! পাঁচজনেই ছোট হ’য়ে

## পঞ্চরোষ

এক জনকে বড় ক'রে তা'র অসঙ্গত অভ্যাস অত্যাচারকে প্রস্তর দিয়ে নিজেরা গৌরব বোধ করে। তাতে অত্যাচারীর অত্যাচার ক্রমশঃ বেড়েই চলে।”

“বাডলেও তুমি কেন নিজের বিপদ নিজে টেনে আনছ ? পরের হিত-অহিতে তোমার কি দরকার ছিল। মুখ বুঁজে আপনার কাজ করে চলে এলেই পারো।”

“ভাব তুমি, কখনও বলবোনা, কিন্তু আজ বড় আঘাত লেগেছিল বলেই আর সহ্য করতে পারলুম না—কক্ষ কথা বলে ফেললুম। সহ্যের একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা বন্ধন পার হয়ে যায় তখন মানুষকে বেঁধে রাখা বড় শক্ত।”

“কি কারণে তোমাদের এত রেবা-রেবি হ'ল শুনতে পাই না ?”

“শুনবে ? শুনবে ?” বলিয়া শচীন্দ্রনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বলিল, তারপর পুনরায় শুইয়া পড়িয়া কহিল, “না, সে অতি কুৎসিত প্রস্তাব কুহুম।—সে কথা তুমি বেঁচে থাকতে কখনও বলতে পারবো না, যদি নেহাৎ শুনতে চাও তবে আগে তোমার খানিকটা বিধ খাইয়ে দিয়ে তার পর বলবো।”

কুহুম-কুমারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “ওগো, তুমি অমন করে অন্ন গায়ে রেগে উঠোনা—স্থির হও। আমি সব বুঝছি, আমার আর শোনবার দরকার নেই।”

“না, কুহুম, এ স্থির হ'য়ে বলবার কথা নয়। প্রবলদের

## শয়্যাপোস্তাস

অত্যাচার দুর্বলদেরই দমন করতে হবে, প্রবল প্রবলের অত্যাচারে শুধু সহায়ত্বই দেখিয়ে যায়।”

কুহুম-কুমারী আর অস্ত্র কথার উত্থাপন না করিয়া শচীন্দ্রনাথের শয্যা রচনায় মন দিল।

গভীর রাত্রে কুহুম নিমিত্ত স্বামীর কপালে পাঁচটি পয়সা স্পর্শ করাইয়া গোপনে গ্রামের সীমান্তে খর্গেশ্বরের মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিল।

( ৩ )

পরদিন প্রাতঃকালে শশব্যস্তে শচীন্দ্রের মাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “বলি, শচীন—একি কথা! আমার মুখ দেখান যে ভার হয়ে উঠলো!”

আগ্রহাষিত হইয়া শচীন্দ্রনাথ মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি মা!”

“মনে করেছিলুম তোমার শরীর খারাপ—এখন আর তোমার কাপে একথা তুলবো না, কিন্তু এ কেলেঙ্কারী কি চাপা দিয়ে রাখা যায়? বড জালা পোরাতে হ’বে সেই আমাকেই।”

“তোমার আবার কি হল?”

“আমার নয় ত আর কার কি হ’বে বলনা? সত্য কলুর বাড়ীতে ডেল আন্তে পাঠালুম—বললে, ও বাড়ীতে ডেল বেচ্চে

## পথরোধ

পারবো না। সিনে মুদ্রির দোকানে আমি নিজে গেলুম, তা সওদা দেওয়া ত দূরের কথা, আমি যে জায়গাটার দাঁড়িয়েছিলুম সে জায়গাটা পর্যন্ত গোবর-জল দিয়ে নিকোলে।”

শচীন্দ্র মাতার কথা, ঠিকমত বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, হয়ত জমিদারের প্রতি তাহার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশের জন্য জমিদারের ভয়ে গ্রাম বাসীরা তাহাদের প্রতি এইরূপ আচরণ করিতেছে। তাই কহিল, “পৃথিবীতে আর কি জায়গা নেই?—আর কি চাকরী ভুটবে না। আমরা কালই এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব—চল। আমি ঠিক কাজই করে এসেছি—কোন অস্ত্রায় করিনি।”

“বালাই বাট!—তুই কেন অস্ত্রায় কর্তে যাবি! তোর বাপের বংশের নিম্নে কখন কাকে-কোকিলেও শোনেনি, আর আজ একি কলঙ্ক!”

শচীন্দ্রনাথ মাতার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কহিল, “তুমি কি বলছ—আমি ঠিক ধরতে পারছি না।”

মাতা গালে একটি অভুলি স্থাপন করিয়া কহিলেন “ওমা, তুই বুঝি কিছুই জানিসনে! তা জানবি বা কেমন ক’রে,—কাল থেকে ত অস্থখ্যেই পড়ে আছিস! আমিও কি ছাই জানতে পারতুম!—গয়লাপী মাগী এসে আমায় বললে, তাই না—”

“কি বললে?”

“বলবে আর কি!—এই তোমার গুণময়ী বউয়ের গুণের কথা।



## বরণোন্নাস

রাত দুপুরে রোগা সোয়ামীকে কেলে রেখে আবাকীর বেটী জমিদার বাড়ীর দরজায় গিয়ে ধরা দেয়! পড়বি ত পড় গয়লা মাগীরই চোখে! গেরোস্তর বউয়ের এই কাণ্ড! আবাকী! হারামজাদি! ছোটলোকের মেয়ে! কাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দাও।”

শচীন্দ্রনাথ কুহুমের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কটাক্ষ করিয়া কহিল,  
“একি সত্য!”

কুহুম-কুমারী উত্তর দিল না, ভ্রূষে উঠিয়া শব্দচাকুরাণীর চরণবধ জড়াইয়া ধরিল।

“ভাল মাহুষ সেজে আর পায়ে ধরে আদিখোতা দেখাতে হবেনা। এসব মেয়েমানুষের গায়ের বাতাসও পাপ” বলিয়া শব্দচাকুরাণী পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

( ৪ )

শচীন্দ্রনাথ ভুলুটিত। কুহুম-কুমারীর প্রতি-চাহিয়া গভীর স্বরে ডাকিল, “কুহুম!”

কুহুম-কুমারী ধীরে ধীরে উঠিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল।  
উত্তর দিতে পারিল না।

শচীন্দ্রনাথ কহিল, “তোমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারি কি?”

কুহুম অধোবদনেই কহিল, “সেটা এখন তোমাদের ইচ্ছা।”

## পথরোধ

“না, ইচ্ছা অনিচ্ছা আমার কাছে কিছু নেই। যেটা প্রকৃত সত্য সেটাকেই আমি অকুণ্ঠিত চিন্তে গ্রহণ করবো।”

“তবে আমার নিকট যাহা সত্য তা’ বলে যাচ্ছি তোমাদের যে ভাবে ইচ্ছা হয় গ্রহণ ক’রো” বলিয়া কুহুম কহিল, “এর আগে যতবারই তোমার অস্থখ হয়েছে. ততবারই তোমার রোগ মুক্তির কামনায় আমি মন্দিরে পূজা দিয়ে আসতুম। কাল রাত্রেও যখন ঋগ্বেদের মন্দিরে যাচ্ছিলুম তখন কোথা থেকে হঠাৎ গয়লাপী এসে আমার হাতটা ধরে বল্লে—জমিদার ডাক্ছে, চল। আমি প্রাণপণে চীৎকার করে উঠতেই সে আমার হাত ছেড়ে দিলে। তারপরেই স্বয়ং জমিদারকে দূরে দেখে আমি ছুটে বাড়ী চলে আসি। এর বেশী আমি আর কিছু জানিনা।”

“তুমি এ কথা আমায় এতক্ষণ জানাওনি কেন?”

কুহুম কহিল, “এখন এ কথাই চাইতে তোমার প্রাণ রক্ষাটা আগে দরকার বলে কোন কথাই তুলিনি, পরে জানাব ভেবেছিলুম।”

শচীন্দ্রনাথ লাকাইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার চক্ষুর্ষয় আরক্ত হইয়া উঠিল, গাত্র বহিয়া ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল। বাহির হইতে শচীন্দ্রের মাতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ছুঁসনে, ছুঁসনে হারামজাদীকে, বেজাতকে ছুঁয়ে অর গায়ে আবার চান করুবি!”

## অরণোদ্যাস

কুহুম করজোড়ে কহিল, “ওগো, আমি তাই—কুলটা তুমি  
অমন করে জর গায়ে লাফিয়ে উঠোনা—শান্ত হও।”

“না” বলিয়া শচীন্দ্রনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।  
কুহুম অগ্রসর হইয়া একবার স্বামীকে ধরিতে গেল, কিন্তু ধরিল না।  
ইহাৎ আপনাকে সংযত করিয়া দূরে সরিয়া গেল।

শচীন্দ্রনাথ ক্রোধে অন্ধ হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া কহিল,  
“কৈ আমার লাঠিটা কৈ!” “ওগো, আমি এখনি তোমার  
বাড়ী থেকে ব’ায় হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি ওরকম উত্তেজিত হয়ে  
উঠোনা।”

শচীন্দ্রনাথ সে কথা কণ্ঠে তুলিল না। “আজ সব খুন করবো  
—আজ সব খুন করবো” বলিতে বলিতে উঠান হইতে একটা  
বংশ-বাঁটি কুড়াইয়া লইয়া শচীন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে বাটার বাহির  
হইয়া গেল।

অস্বস্থাবস্থায় শচীন্দ্রনাথ বাটার বাহির হইয়া গিয়াছে খবর  
পাইয়া স্বশ্রীকুমারী আসিয়া পূজবধুর উপর সকল দোষ চাপাইয়া  
কহিল, “তুই সর্বনাশী-ই ত আমার বাহার সর্বনাশ করতে  
বসেছিস্। তোর একটু আকৈল হলনা। অমন অবস্থায় বাছাকে  
আমায় ছেড়ে দিলি কেমন করে!”

কুহুম কহিল, “আমার ত আর সে শক্তি সেই, আমি ত আর  
তাকে স্পর্শ করতে পারিনা।”

## পথরোধ

“নেকি, মক্ষমাগী হ’য়ে একটা রোগা লোককে আটকে রাখতে পারিস না! হাড়-হাবাতে ঘরের মধ্যে হ’লে এমনি ধারাই হয়!”

কুহুম ধীর-নম্র বচনে কহিল, “মাগো, আমি আর তোমাদের কেউ নয়, আমি তোমাদের নিকট অস্পৃশ্য!”

“জ্বাকামো ত খুব শিখেছ! যাও এইবার ঘর ছেড়ে একটা আধটা বৈরাগীর চেষ্টা দেখগে,—আর কেন?”

কুহুম শ্রষ্টাকুরাণীর কথার সমর্থন করিয়া ভাবিল সত্যই ত,—আর কেন! স্বামীর নিকট জ্বী যখন অস্পৃশ্য, কুলটা হয়, তখন তার আর সংসারে থাকা ত চলে না! সংশয়-দৃষ্টির সম্মুখে সে ত টিকিতে পারিবে না! এক আত্ম-হত্যার দ্বারা সে সকল সংশয়-অসংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে মরিয়াও ত সুখ নাই। তাহাতে সংশয়ের বীজ ত দূর হইবে না, বরং স্থ-অস্থিরিত হইয়া পত্র-পুষ্পে স্থশোভিত হইয়া উঠিবে! তবে কি সে সেই অনন্তপথে ধাবিতা হইবে—যেখানে যান্ধব নিন্দা-গানিকে তুচ্ছ ক’রে অতীতভোলা-চিরযদলময়ের অন্বেষণ করে! হাঁ, সেই উত্তম! লোকে চিরকাল অপবাদ রটনা করিবেই; কিন্তু কর্তব্য তাহার বধির থাকিবে!

কুহুমের বোধ হইল কে যেন তাহার পশ্চাদ্বেশ হইতে ধীরে ধীরে ঠেলিতে লাগিল। বোধহয় সে একটু অগ্রসরও হইয়াছিল এমন সময় দ্বারদেশে কল্পিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “কুহুম!”

## মরণোন্মাদ

কুহুমের স্বপ্ন ও চিন্তা নিমেষে উড়িয়া গেল। স্বপ্নাকুরাণী এবং কুহুম উভয়েই ছুটিয়া সদর দরজার যাইয়া দেখিল—শটীক্সনাথ রক্ত রঞ্জিত হইয়া ধূলিতে লুটাইতেছে।

স্বপ্নাকুরাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শটীক্সনাথ ইঙ্গিত দ্বারা মাতাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া থাকিল, “কুহুম।”

কুহুম স্থিরনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল ; শটীক্সনাথ কহিল, “মরণ বরণ করেও পিশাচের উপযুক্ত শাস্তি দিবে এসেছি। এ মরণে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, বরং তুমি নিঃকলঙ্ক জেনে মরতে পারুছি বলে আনন্দে আনন্দধাম পাব। আমার অন্তরাত্মা আমায় জানিয়ে দিচ্ছে—তুমি দেবী। কোথের বশে তোমায় অনেক দোষ দেওয়া হয়েছিল—কমা করো।”

কুহুম স্বামীর হস্তবর চাপিয়া ধরিল। শটীক্সনাথ কহিল, “কুহুম আর বেশী কথা বলতে পারুছিনা, মাথায়—একটু হা—ত—”

শটীক্সনাথ আর কথা বলিতে পারিল না। তাহার শেষ বাক্যের সহিত শেষ নিশ্বাসও বাহির হইয়া গেল।

শটীক্সের মাতা আছাড়িয়া ক্রন্দনের রোল তুলিলেন। প্রতি-বাসিনীরী নীত্রে আসিয়া ‘দোয়ার’ ধরিল, কিন্তু কুহুম কাঁদিল না।

স্থিরনেত্রে মৃত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় ভাবিল,—

## পথরোধ

আর কেন ! স্বামী !—ব্রহ্মপীর একমাত্র শোভন, সহায়, পালক ! সেই স্বামী বা'র নাই তার আর কেন ! যে স্বামী, জীব প্রীতি অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে রোগ শয্যা ছেড়ে বৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে, তাঁর জী আমরণ তারই সংসারে বসে কেমন ক'রে স্বতির দংশন সহ্য করবে ! না, সে আর এ সংসারে প্রবেশ করতে পারবে না । কণপূর্বে যে পথ সে বেছে নিয়েছিল, সে সেই পথই ধরবে । সে সেই অনন্ত পথে আবার তাঁর স্বামীকে খুঁজে নেবে !

কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইল । একপদ অগ্রসর করিয়া দিয়াছে এমন সময় উচ্চ ক্রন্দনের শব্দে শচীন্দ্রের একমাত্র সন্তান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাতাকে অভাইয়া ধরিয়া কহিল, “মি—নিখা—ব ।” কুসুমের শুক চক্রে স্বপ্নপার ধারা বহিল । তাহার অনন্তপথে যবনিকা পড়িল—সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না ।

## কেরানী

মাস কাবার।

পুলিশ-ব্যারাকের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিতে-ই জলধর পাল গৃহিনীকে তাগাদা দিয়া कहিলেন, “কৈ গো, তোমার বে নড়ুতে-চড়ুতেই সাতমাস! রোজ রোজ এ রকম ক’রে ‘লেট’ হলেই চাকরীর দফা হয়েছে।

“এই যে দিচ্ছি” বলিয়া ককালসার গৃহিনী হাঁড়ি হইতে দুই-চারি হাতা অর্দ্ধ-সিক্ক সন্ধান ভাত ও খানিকটা বেগুণ পোড়া খালায় সাজাইয়া দিয়া कहিলেন, “একটা মাছ, কি করি বল? যাহোক ক’রে একটা যদি বাসন মাজা ঝিও থাকতো তাহলে আর এতটা অসুবিধে হ’ত না। তার উপর বলদেও কয়লা-ও’লার কাছে তিন-তিনবার ছেলে পাঠালুম—ফিরিয়ে দিলে। তাদেরই বা দোষ কি? সাতমাসের দাম তিনমাস ধরে বাকী! তবু যাহোক ছেলে গুলো নন্দীদের বাগানের কাঠ ফুড়িয়ে এনেছিল!”

জলধর পাল গরম ভাতে হুঁ দিয়া কোন ক্রমে নাকেমুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িলেন। শতছিন্ন সার্টটিকে চাপা দিয়া তাহার উপর মলিন ছিটের কোটটিকে চাপাইলেন। কাপড়ের জীর্ণ অংশের দিকটা কোচার দিকে টানিয়া পরিলেন। তার পর বুক-পকেটস্থিত

## কোরানী

ট্রেনের 'মহলী-টিকিট'টা একবার দেখিয়া লইয়া বাজার উদ্ভোগ করিতেছেন এমন সময় বাহির হইতে রসিক সুদি ডাক দিল, "জলধর বাবু বাড়ী আছেন।"

"আঃ আলাতন করুলে!" বলিয়া জলধর পাল পুত্রকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে ডাকিয়া চুপি-চুপি কহিয়া গেলেন, "বা বলগে, বাবা বাড়ীতে নেই—অফিস চলে গেছেন।"

পিতৃ-আদেশ সমাধানে পুত্র ফিরিয়া আসিয়া ক্রন্দনের স্বরে কহিল, "গত মাসের স্কুলের মাইনে এখনও মিলেনা, বাবা? আজ না দিলে হেড্-মাষ্টার নাম কেটে তাড়িয়ে দেবেন বলেছেন।"

জলধর পাল মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "এই মাস নিরে মোটে ত দু'মাস বাকী? আচ্ছা, সে হ'বে এখন,—আজ আর স্কুলে বাবার দরকার নেই।"

সারাদিন স্কুলের বন্ধন হইতে এবং হেড্-মাষ্টারের মাহিনার তাগাদা হইতে নিষ্কৃতি পাইল ভাবিয়া পুত্র মহানন্দে নাচিতে-নাচিতে চলিয়া গেল।

জ্যেষ্ঠা কস্তা ছুটিয়া আসিয়া পিতার দক্ষিণ হস্ত স-জোরে দুইকরে চাপিয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "স্বরেশ কাকার মেয়ের মত কল্‌কাতা থেকে আমার একটা জামা এনো না বাবা? গত বছর পূজোর সময় যে জামাটা দিয়েছিলে সেটা অনেকদিন ছিঁড়ে গেছে। আর আমার পর্দবার একটাও জামা নেই।"



## অন্নপোন্নাস

“অত যোরবার আমার কি আর সময় আছে পুঁটু ? দেখি পারি যদি চেষ্টা করবো।” বলিয়া কস্তাকে আশ্বস্ত করিয়া জলধর পাল ক্যাশিসের জুতাটা পরিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহা একে বারেরই ছিঁড়িয়া গিয়াছে—কোন মতেই পায়ে লাগান যায় না। অগত্যা নর-পদেই বাহির হইতে হইল।

( ২ )

বাটা হইতে ষ্টেশনের দূরত্ব চার মাইল।

পথে মোটর-বাসের ও ছ্যাকুড়া গাড়ীর ধুলা খাইয়া খানিক ছুটিয়া, খানিক হাঁটিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে জলধর পাল ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলেন,—ট্রেন সবেমাত্র ছাড়িতেছে। কুলীদের চীৎকার ও ষ্টেশন-মাস্টারের ধমকানি সত্ত্বেও তিনি চলন্ত-গাড়ীতে লাকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। মস্তকে ও পদে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কোচাধারা হাঁটু পর্যন্ত ধুলা ঝাড়িয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া জলধর পাল কহিলেন, “কৈ হে, আজ যে তোমাদের এখন ও বসেনি দেখছি ?”

শটিন সরকার কহিলেন, “আরে ভূমি মাস্টার না এলে কখনও খেলা জমে।”

## কেরানী

স্বধীর দত্ত কহিলেন, “নাও, পরাগ, ঝাড়ন খানা পাত। এ  
তেখ ছি, একটা দানও আজ শেষ হবে না।”

পরাগ বিশ্বাস চারিজনের কোলে ঝাড়ন খানি পাতিয়া পকেট  
হইতে তাসের প্যাকেটটা বাহির করিয়া দিলেন।

গোকুল পালিত, জলধর পালের নব্ব পদ দেখিয়া কহিলেন, “কি  
দাদা, খালি পায়ে বে !”

জলধর পাল সসকোচে পদধর বেঞ্চের তলায় আরও একটু  
ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, “আর ভাই বল কেন। পুকলিয়াতে মেজ-  
মামি মারা গেছে—সকালবেলা টেলিগ্রাম এসে হাজির ! মাতুল-  
বংশ—না ম্যান্লেও চলে না।”

“ভাই নাকি !—তাহলে ত খুব বড় ভোজ লাগ্ছে ?”

“লাগ্লে আর কি হ’বে—অফিসের ছুটা পেলো তবে ত  
যাওয়া ?”

ভূপেন নীল গাড়ীর এক কোণ হইতে উঠেঃবরে কহিলেন,  
“মামা, তোমাদের ওখানে আজকাল ইলিশ মাছ না কি খুব সস্তা  
গুন্ছি ?”

হাতের শেষ তাস খানি সজোরে ঝাড়নের উপর ফেলিয়া দিয়া  
জলধর পাল মুখ তুলিয়া কহিলেন, “সস্তা বলে সস্তা ! আজ-ই  
ত সাত আনা দিবে দেড় সের একটা ডিমও’লা গন্ধার ইলিশ নিয়ে  
এলুম। শালার বা তেল বেরিয়েছে,—ভোমায় কি বলবো ভায়ে !

## মরণোন্মাদ

—তা’তেই গোটা মাছটা ভাজা হ’য়ে গেল। আমি ত আজ ভাল-  
তরকারী ফেলে রেখে শুধু মাছ ভাজা দিয়েই ভাত খেয়েছি।”

স্বধীর দস্ত গম্ভীর ভাবে কহিলেন, “এই যে বল্লো তোমাদের  
অশৌচ হয়েছে! তবে আবার মাছ খেলে কি করে?”

জলধর পাল অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, “আবু—রেখে  
দাও তোমার অশৌচ, তিনদিন অন্তর একজন ক’রে আত্মীয় মরবে,  
আর না খেয়ে পড়ে থাক,—হা! পায়ের জুতোটা খুলেছি এই ঢের!”

“নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই” বলিয়া গোকুল পালিত কহিলেন, “তা  
হলে, আসছে রবিবার দিন দাদার বাড়ী ইলিশ মাছ খাবার নেমস্তন্ন,  
—কি বল দাদা?”

“সে ত সৌভাগ্যের কথা; সে বরাত কি আর করে এসেছি।  
তবে রবিবার দিন খুব সম্ভব আমি বাড়ীতে থাকবো না।” বলিয়া  
উপভাস-পাঠরত মথুর বাক্চির প্রতি চাহিয়া জলধর পাল কহিলেন,  
“কি হে বাগ্‌চি, তুমি যে চূপ্-চাপ্ বসে আছ! কৈ পাওনাটা কৈ?”

টিনের টিকিন বাক্সের এক কোণ হইতে ব্যজন-মাখা একটা পান  
বাহির করিয়া দিয়া মথুর বাক্চি কহিলেন, “ভেবেছিলুম, দাদার  
অশৌচে বুঝি আজ আমার একটা পান বাচবে!”

“তা কি হয় বাবা!—এ যে আমার নিত্য-নৈমিত্তিক পাওনা,  
কসকালে চলবে কেন? দাও পরাণ লাল-সুতোর একটা বিড়ি  
দাও? তোমাদের ওখানকার বিড়ি ভালো বাঁধে ভাল।”

## কেরানী

ভূপেন শীল পুনরায় কহিলেন, “মামা, তোমার ও কোট্টা কি মুতেও দেবেনা, ছাড়বে ও না ? ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করা আরম্ভ থেকে এই দশ বছর-ই ত ওটাকে দেখে আসছি !”

“আরে এটা আমার রক্ষা-কবচ। পুরাণো হোক আর ছিঁড়েই যাবে এটা না থাকলে চাকরীর দশা এতদিন গন্না হয়ে যেত। এটা না ধুঁ'রে একদিন অফিস গিয়ে যা ভোগাই ভুগেছিলুম, তা আমি-ই জানি ; সে আর শুনে দরকার নেই।”

“আরে দেত্তেরী, ওসব বাজে কথা যেতে দাও” বলিয়া শচীন সরকার পুনরায় তাস ভাঁজিতে আরম্ভ করিল।

( ৩ )

হাওড়া ষ্টেশন হইতে পদব্রজে অফিসে পৌঁছিতে অর্ধঘণ্টারও অধিক সময় লাগিল। বড়বাবু চশমার উপর দিয়া চোখ বাহির করিয়া জলধর পালকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, “ক’টা বেজেছে একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ দেখি ?”

“আজ্ঞে পোনে-বারটা।”

“তা বেশ ; কদিন ‘লেট’ হল ?”

“আজ্ঞে, তা ঠিক মনে নেই।”

“এ আর ত আমি বরদাস্ত করিতে পারি না।”

“আজ্ঞে আমার শুধু দোষ নেই—‘খার্ড-বর্ডমান’টা মাঝে মাঝে বেজায় মেরী করে—”

## মল্পপোল্লাস

বড়বাবু চশমাটা কপালে উঠাইয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, “লেট্টে কেবল তোমার একলায়ই হয়! এতগুলো লোক অকিসে চাকরী করে, তারা কি করে সময়ে আসে?”

“আজ্ঞে, তাদের মোটা মাইনে—অনায়াসে ট্রায়-বাসে যাতায়াত করে। আমার—”

“চাকরী রাখতে গেলে তোমারও তা করার দরকার বৈকি! কেন, রামদীন দারোয়ানটাও ত ৩০ টাকা মাইনে পায়,—সে। কি ক’রে সময়ে হাজুরি দেয়? আমি আর আন্ধারা দিতে প’রবো না, বাধ্য হ’য়ে বড় সাহেবকে আজই জানাতে হ’বে।” বলিয়া বড়বাবু চেয়ারটা একটু নাড়িলেন।

বড়বাবুর চেয়ারের পশ্চাতে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর সহোদর ঠাড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এবং বড়বাবুর চেয়ার সঞ্চালনে জলধর পালের অন্তরাখ্যা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ বোধ হয় ভূ-গর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে; বাকীটা শীত্বেই ডুবিবে। তিনি আর কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া সটান টেবিলের নিম্ন দিয়া বড়বাবুর পদস্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, “বড়বাবু, আপনি আমার মা-বাপ; আপনার দয়াতেই চার-পাঁচটা কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে বেঁচে আছি। আপনার পায়ে গড়ি বড়বাবু, এবারকার মত আমার কমা করুন।”

অকিসের অপ্রাক্ত বাবুয়া কর্ণে লেখনী শুঁজিয়া একবার করিয়া

## কেরাণ

বজ্র-নয়নে এই ‘গা-সওয়া’ দৃষ্ট দেখিয়া লইয়া পুনরায় পা দোলাইয়া আপন-আপন কার্যে মন দিলেন ।

বড়বাবু ভালকের সম্মুখে আপন পদমর্যাদার গাভীর্ষ দেখাইয়া রুদ্ধস্বরে কহিলেন, “খবরদার, আর যেন এরকম না হয় । যাও, এবার তোমায় মাপ করা গেল ।”

জলধর পাল নিমেষ মধ্যে আপন টুলটা অধিকার করিয়া কলম হস্তে মনে মনে বলিলেন, “বাবা তারকনাথ, তুমিই আছ ! সেওড়াকুলী ষ্টেশনে উদ্দেশে যে রোজ কপাল ঠুকি সে কি বুখাই যেতে পারে ।”

দুপুরে শটীন সরকার ব্যস্ত হইয়া টিফিন-ঘরে আসিয়া কহিলেন, “মাষ্টার আজ যে গেই লিফ্-টার কাইডাল ।”

“তাই নাকি ?”

“হাঁ-হাঁ, মোহন-বাগান আর ইষ্ট-বেঙ্গল ।—”

“তাহলে ত খুব contested—up and down game হবে।”

“নিশ্চয়ই—”

“যাচ্ছ নাকি ?”

“সে আর বলতে—আমি ত ‘পয়ে-আকার’ দেবই । তবে একলা গিয়ে তেমন ফুর্টি হয় না, মাষ্টার চল না ?”

“যেতে ত খুবই ইচ্ছে, কিন্তু আজকে যে আবার মাইনের-দিন হাই ! তার উপর শালা বড বাবু যেন ষকের মত বসে থাকে !”

## অরুণোদয়

“আরে, তোমাদের বড়বাবু ত এইমাত্র কে একজন ছোকরাকে নিয়ে অফিসের গাড়ীতে বেরিয়ে গেলেন।”

“তাই নাকি? তবে ত ভালই হয়েছে। মাইনেটা Draw করে চল এইবেলা তবে সরে পড়া যাক।”

“তাহলে শীগ্‌গির এস, আমি ‘গেটে’ অপেক্ষা করছি।” বলিয়া শচীন সরকার চলিয়া গেলেন।

( ৪ )

মাহিনার ৩-১ টাকা পকেটে ভরিয়া জলধর পাল ক্যালকাটা-ব্রাউণ্ডের নিকটে আসিয়া কহিলেন, “চল, কেম্‌বার দিকে গিয়ে দাঁড়ান যাক।”

শচীন সরকার বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “না, না রোজ রোজ ওখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। আজ আবার কাইন্সল-ম্যাচ—দেখনা এখন থেকেই কত ভীড় লেগে গেছে। চারগুণ্ডা পরসার ত মাঝলা! চল-চল, ভেতরে গিয়ে ঢোকা যাক।”

“ভেতরে—এঁ্যা—ভেতরে?” বলিয়া টানিয়া-টানিয়া কথা বলিয়া জলধর পাল পকেট হইতে তিনখানি দশ টাকার নোট দেখাইয়া কহিলেন, “তবেই ত যাচী করেছে। আমার কাছে যে ছাই মুচুরো পরসার একটাও নেই—সবই নোট। তা কি করা যায়?” অদূরে পকেট-মার নোটগুলি দেখিয়া লইয়া মুচুন্দিয়া হাসিল।

## কেরানী

শতীন সরকার कहিলেন, “তোমার কাছে কি খুচরো পয়সা একদম নেই?”

জলধর পাল নোটগুলি পুনরায় পকেটে পুরিয়া कहিলেন, “তা—তোমার কাছে কি চারগুণা পয়সা বেশী হবে না সরকার? থাকে যদি দিয়ে দাও,—কাল অফিসে এসে আবার না হয় ফেরৎ দেওয়া যাবে।”

কার্টের রেলিংয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিবার সময় পকেট-মার নিঃশব্দে জলধর পালের পকেট হইতে নোট তিনখানি তুলিয়া লইল। জলধর পাল তাহা আদৌ টের পাইলেন না, অনন্তমানে গ্যালারিতে গিয়া উপবেশন করিলেন।

পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক পূৰ্ণ-বঙ্গবাসী ভদ্রলোক জলধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশয়, সবুজ আর লাল পিরেণ পৈরে যারা খ্যালছেন,—উহারা কোন্ দল বটে?”

জলধর পাল হাসিয়া উত্তর দিলেন, “খেলা দেখতে এসেছেন মশাই,—মোহনবাগানের Uniform চেনেন না!”

“আমাকোর এখানে ঘর নয় মশয়, সেই কারণে জিজ্ঞাসা করছিলাম। বিপক্ষদল বোধ করছি পূৰ্ণ-বঙ্গ হইবে?”

“হাঁ, হাঁ,” বলিয়া শীঘ্র উত্তর দিয়া জলধর পাল খেলা দেখিতে-দেখিতে মহা উত্তেজিত হইয়া कहিতে লাগিলেন, “গো—গো—গো—গো—গো—অ—ঐ যাঃ।—দূর—দূর কোন কাজের নয়।



## মরণোন্মত্তা

—দূর ক'রে দাও, দূর করে দাও মাঠ থেকে!—সট—সট—সট—  
কাউল!—কাউল!—জোচ্চোর রেকারী,—জোচ্চোর রেকারী!—  
মারো—মারো শালাকে!”—বলিয়া উত্তেজনার বশে জলধরের  
মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তটী স-জোরে পার্শ্বস্থিত পূর্ব-বঙ্গবাসীর নাসিকার  
উপর গিয়া পড়িল। তিনি স-জোরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন,  
“মশয়, হালা কন, কের আমাকো নাকে দা দেন্।”

জলধর পাল অপ্রতিভ এবং ভীত হইয়া কহিলেন, “মশাই, কিছু  
মনে করবেন না,—আমি আপনাকে ইচ্ছাসম্মে মারিনি।”

“বান্ মশয়, আমি দুই দিন আসিঘে কলুকেতার লোকরে উত্তম  
করিঘে চিনে লইছি।” বলিয়া পূর্ববঙ্গবাসী আর উত্তরের অপেক্ষা  
না করিয়া হাতের আস্তানা গুটাইয়া ঘুসি চালাইতে আরম্ভ করিয়া  
দিলেন।

কলিকাতার নিম্নমাছুদারী একটা বিরাট কোলাহল সৃষ্ট হইয়া  
আশে-পাশেও রীতিমত মারামারি হইয়া গেল। পুলিশ আসিয়া  
দাশা থামাইয়া কতকগুলি লোককে থানায় চালান দিল।

শতীন সরকার দাশার প্রারম্ভেই মসী-জীবির কর্তব্য সম্পাদন  
করিতে গ্যালারী হইতে লাকাইয়া বাহিরে পলাইয়াছিলেন। ফিরিয়া  
আসিয়া দেখিলেন, তাহার মাষ্টার রক্তাক্ত কলেবরে সংজাহীন  
অবস্থায় মাঠের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

মাষ্টারের অচেতন দেহ ট্যান্সি করিয়া হাওডায় আনিয়া শতীন

## কেরানী

সরকার পাঁচজনের সাহায্যে কোনক্রমে তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া তুলিয়া দিলেন। জলথরের স্ত্রী এবং পুত্রকন্টার জন্মনের শব্দে পাশের বাড়ীর ‘পদ্ম’ পিসি ছুটিয়া আসিলেন। পরের দুঃখ-দুর্দশায় ‘আহা’ করিবার অন্ত তিনি সৰ্ব্বদাই ব্যগ্র থাকেন, এবং পরিনিম্পাপুরাণ না শুনিয়া তিনি কোনদিন জল-গ্রহণও করেন না।

অজ্ঞাপান্ধ ঘটনা শুনিয়া ‘পদ্ম’ পিসি কহিলেন, “এই সব গোরাগের খেলা খেলতে গেলে ত শুনেছি খেলোয়াড়দের হাত পা ভাঙ্গে, কিন্তু দেখতে গেলেও আজকাল ভাঙ্গে নাকি !”

ভাত্তার আসিল ; রোগী দেখিয়া কহিলেন, “এ—এয়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে। একটু আগেও যদি খবর পেতুম তাহলে লোকটা বেঁচে যেত। যাক, তবে আজকের রাত্‌টা টিকে যেতে পারে। কৈ—আমার.....” বলিয়া হাতটা কিছুক্ষণ পাতিয়া থাকিবার পর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “দেবী করো না,—আমার ত আর একটা রুগী নয়, পাঁচ জায়গায় এখনও যেতে হবে।”

জলথরের স্ত্রী সজল নয়নে সকলকার মুখের দিকে একবার করিয়া তাকাইয়া অবশেষে ‘পদ্ম’ পিসিকে কহিলেন, “পিসি, দু’টো টাকা ধার দাও না ?”

‘পদ্ম’ পিসি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, “আমারই বলে আজ চাল বাড়ন্ত ;—আমি কোথায় পাব বাছা।” বলিয়া একটু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

## অরণোন্নাস

হঠাৎ অলখরের জীৱ অৱণ হইল—আজ যে মাস কাৰাৰ !—  
মাহিনাৰ দিন ! তাড়াতাড়ি স্বামীৰ কোটেৰ পকেট, সাৰ্টেৰ  
পকেট, কোঁচাৰ খুঁট পুৰ্ণাৰুপে দুইচাৰিবাৰ কৰিয়া খুঁজিলেন,  
কিন্তু কিছুই পাইলেন না ।

তখনও ডাক্তাৰ বাবু হাত বাহিৰ কৰিয়া দাঁড়াইয়া আছেন  
দেখিয়া অলখরের জীৱ কৰবোড়ে মিনতি কৰিয়া কহিলেন, “ডাক্তাৰ  
বাবু, বড় গৰীব—ডাক্তাৰ বাবু !”

ডাক্তাৰ বাবু বিমৰ্ষ হইয়া বলিলেন, “সবাই যদি গৰীব বলে,  
আমাদের চলে কোথা থেকে !”

‘পদি’ পিসি গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া কহিলেন, “তাই ত, তাই ত ।  
—আহা ! বেচাৰা মৰেও যাচ্ছে, পাঁচটাকে মেয়েও যাচ্ছে ! কি  
দুৰ্ভাগ্য বল দেখি !—মাবাৰ সময় এক পয়সা ঘাটেৰ খৰচও বেখে  
যেতে পাৱলি না বাপু !—একেই বলে কেৱালীৰ ভাগ্য !”

---

## “জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

পিণাকি ও মঞ্জুয়া উভয়ে উভয়ে তাল বাসিয়াছিল, কিন্তু এই তালবাসার প্রারম্ভটা কবে থেকে সেটা ঠিক মনে নেই,—কেননা, ভালবাসা জিনিষটা এমন একচক্ষু-বিশিষ্ট যে তার গভীর ভিতর থেকে অল্প কাহারও দিকে চক্ষু ফিরাইলেই সে তফাতে সরিয়া যায়। বাধ্য হইয়া অল্প সকলকার কথা তখন উভয়কেই ভুলিতে হইয়াছিল। বার, তিথি বা ডায়েরী খাতা তখন তাহারা চিনে নাই যে লিখিয়া রাখিবে। তখন পিণাকির বয়স আট, মঞ্জুয়ার পাঁচ।

তবে একদিনকার কথা পিণাকির আঙ্গণ বেশ মনে পড়ে—  
যেদিন সে মঞ্জুয়াকে তাদের ছাদের আলিসার উপর কপোত-  
কপোতীর নিবিড় প্রেমালিঙ্গন দেখাইয়াছিল। পিণাকি বলিল,  
“দেখ মঞ্জু, ওদের হৃৎকনের কত ভাব! ওদের এত ভাব বলেই  
এরা সবচেয়ে সুখী।” মঞ্জুয়া তখন কিছুই বোঝে নাই তথাপি  
কেন জানিনা সেইদিন হ’তেই তার মনের কোণে কোথাও একটু  
কঁক পেয়ে এক বলক আলো ঢুকে পড়েছিল। পিণাকিকেও প্রকৃত  
তখন রঙীন কল্পনা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রেমের পথে  
আলাপন ছাড়া অতিরিক্ত আরও কিছু যে আছে, সে কথা তখনও  
তার মনে উদয় হয় নাই।

দিন যায়।

## মরণোন্মাদ

বালায়গ আসিয়া পিণাকির উপর জঁকিয়া বসিল। সে মঞ্জুধার কঠোরতাকে কোমল করিয়া দেখিল, ক্রন্দনকে সোহাগ ভাবিল, অভিমানকে দূত মিলন আকাজ্জ্বল পূরীভাব বলিয়া মনে করিল।

মঞ্জুধার চুলগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিতে তাহার বড ভাল লাগিত। যখন-তখন সে তার কচি আঙ্গুলগুলিকে মট্কাইয়া দিয়া আনন্দ অনুভব করিত।

পুষ্পোদ্ভানে নিত্যই একঘেঁয়ে ফুল যেমন দৃষ্টিতে আর রস পরিবেশন করিতে পারে না, তেমনই প্রত্যহ একই প্রকার বস্ত্র পরিহিতা মঞ্জুধাকে পিণাকির কেমন দৃষ্টি-কটু লাগিত।

সে মঞ্জুধাকে বলিত—“মঞ্জু তোমার বাবার এত টাকা থাকতে তবুও তুমি রোজ রোজ একই কাপড় প'রে থাক কেন?” মঞ্জুধা কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিত না। তবে পিণাকি উৎসাহিত কথ্যটি অন্ততঃ পিণাকির নিকট বজায় রাখিবার জন্ত সে মাতার নিকট কান্নাকাটী করিয়াও মাঝে-মাঝে লট্‌কানে ছোবান কিংবা খুন-খারাপী রংয়ের কাপড় পরিয়া আসিত।

পিণাকি সজ্জিতা মঞ্জুধাকে দেখিয়া একটু বেশী আনন্দ উপভোগ করিত। বেশহীন মঞ্জুধাকে গ্রহণ করিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। মসি-লেপিত একবর্ণ চিত্র অপেক্ষা রঞ্জিত চিত্রই শিশুদের অধিকতর প্রিয়।

বালায়-রাগের হাওয়া বহিলেও হৃদয়ে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে

## “জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

পিপাকি তখনও শিখে নাই। মঞ্জুবারও নিকট এসব খাল্য-লীলা। তাহার প্রতি পিপাকির সকল ব্যবহার-ই তার দৈনিক ক্রীড়ার একটা অংশ বলিয়া সে গ্রহণ করিত। রসবোধ অপেক্ষা সে বেশী উপভোগ করিত—কৌতুহল।

মঞ্জুবার গঠনের উপর হইতে সৃষ্টিকর্তার হস্ত অপসারিত না হইলেও মঞ্জুবা অনেক পরিমাণেই সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ছিল। তার চাহনি স্নিগ্ধ হইলেও চোখের কালো তারাছুটো অলসভাবে স্থির থাকতে পারতো না—অস্থসন্ধিৎ হ'য়ে সাদা মাঠে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াত। নয়নদ্বয়েব বিজুতি আকর্ষণ না হইলেও—হঠাৎ চক্ষু নয়, কপাল একরস্টিই বলতে হ'বে—গড়ের মাঠের তুলনা আসতে পারে না। নাসিকা বংশী-সদৃশ অথবা খগ-নাসা-জয়ী না হইলেও 'চাইনিজি' নাক বলা যায় না। অঘরোষ্ঠ সংস্পর্শ শিহরণে রক্তিমাত ৭২—স্বভাবতঃই পাকা বটফলের মত লাল ও কোমল। বর্ণ—পছন্দ সহ।

নায়িকা কুরূপা বলিয়া পাছে তাহাকে কেহ অগ্রাহ্য করে এবং 'বসন খানি শাসন করে তোলা'র সময় পাঁচজনকে রূপ দেখান অসম্মত এবং তোমাদের নিকট দোষাণী বলিয়া মঞ্জুবা বাল্যে-ই রূপ দেখাইয়া দিল। ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পূর্ণাঙ্গের রূপ দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে পাঠক-পাঠিকারা যেন কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন। তাহাকে লজ্জা দিবার প্রয়োজন নাই।

## অরণোক্তাস

মজ্জার পিতা ছিলেন সবজ্জ। তখন মেদিনীপুর কি বাঁকুড়ায় ছিলেন সেটা ঠিক মনে নেই। তিনদিন অস্তর বদলীর জালায় গাধাবোটের মত খুঁটিনাটি সংসারের যাবতীয় জিনিষ-পত্র পিঠে বোঝাই ক'রে ঘুরতে ঘুরতে মজ্জার মা'র শরীর ভেঙ্গে প'ড়েছিল। তাই মজ্জা জন্মাবার পরই, সহধর্মিণী আখ্যা হ'তে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে তিনি স্বামীকে একল। মকঃস্থল-তীর্থে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে তাঁদের কল্কাতার বাড়ীটা একেবারে খালি ছিল। মজ্জারা আসিতে আবার মৃতন ক'রে তার রং এবং ঢং উভয়ই ফিরিল। মজ্জার মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত সংসারের অল্পপান এক বিধবা পিসীও এলেন।

মজ্জাদের গলিতে একটা মেয়েদের স্থল ছিল,—দিনে একবার ক'রে সেখানে মজ্জাকে হাজরি দিতে হ'ত। বিদ্বাঙ্গ'নের মূলধন ছিল তার—একখানা ক্রেমখোলা স্লেট, একখানা মলাটহীন বিদ্যা-সাগরি বর্ণপরিচয়, একটুকুরো স্লেট-পেন্সিল আর বেঙ্গল কোমি-ক্যালের কার্কলিক টুথ্‌পাউন্ডারের কৌটায় খানিকটা ভিজ়ে জ্বাকড়া।

এই বিদ্যালয়ের পথেই পিণাকির সহিত তার প্রথম সাক্ষাৎ হ'ত। পরিচয়টা হয়েছিল একটু অস্বাভাবিকতার ভিতর দিয়ে। পিণাকি-দের বাড়ী ছিল ঠিক মজ্জাদের পাশে। যেদিন মজ্জা প্রথম স্থল বাঁচ্ছিল তখন তার সঙ্গে ছিল একটা ঝি। পথে পিণাকি বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল—মারবেল। মজ্জার পায়ে লেগে তাদের একটা

## “জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

শাব্বেল ড্রেনের মধ্যে পড়ে যায়। সেটা তার ইচ্ছাসঙ্গে কি অসাবধানতায় ঘটেছিল তা ঠিক বলতে পারি না। বাই হোক, সঙ্গে ঝি থাকায় ছেলেদের রাগটা সেদিন পিঞ্জরাবদ্ধ হ’য়েই রইল। পরদিন ঠিক এইসময় মঞ্জুষাকে একলা পেয়ে ছেলেদের প্ররোচনার পিণাকি গুণ্ডামীর অভিনয় দেখিয়ে তার বর্ণ-পরিচয়খানা নিলে কে’ড।

ক্রি-প্রেসের সংবাদ পিণাকির পিতার কাছে পৌঁছিতে বেঈন্দ্রী হ’ল না। তিনি পুত্রের কর্ণমর্দনান্তে তাকে ক্ষমা ভিক্ষা করে মঞ্জুষাদের বাড়ী বই ফেরৎ দিতে পাঠিয়ে দিলেন।

পিণাকি ক্ষমা চাহিতে নারাজ। সে মঞ্জুষাদের বাইরের জানলা তলে ঘরের মধ্যে বই-খানাকে ফেলতে যাবে, এমন সময় মঞ্জুষাদের হিন্দুস্থানী চাকর এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল গিন্নিমার কাছে।

গিন্নিমা জিজ্ঞাসা করলেন—“ই্যা বাছা, তুমি জানুলায় উঠেছিলে কেন?”

পিণাকি চালাক ছেলে, কহিল, “এই বইখানা অল্প আর এক-জন ছেলে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলো—আমি তার কাছ থেকে আদায় ক’রে আপনাদের ফেরৎ দিতে এসেছি” বলে বইখানা মঞ্জুষার মার হাতে দিয়ে দিলে।

প্রেম-প্রাবিত বৈষ্ণব দেশে প্রমাণের আবশ্যক নাই—বিশ্বাসই য়ল। মঞ্জুষার মাতা দালকের এবস্থি অযাচিত সজ্জন্যতা দেখিয়া



## স্বরণোন্মাস

কহিলেন, “আহা, খাসা ছেলে ! তুমি রোজ এসে আমাদের মঞ্জুর সঙ্গে খেলা ক’রো।” পিণাকিরও একপদ ত্রি-রাগের প্রথম সোপানে স্থান লাভ করিল।

বালক-বালিকার ভবিষ্যৎ অঙ্ককার জীবনের গ্লান্বমান সলিতায় প্রথম আশ্রয় ধরাইয়া দিল—অভিভাবিকা, বালক-বালিকা নির্দোষ। পিণাকি-মঞ্জুর এই শৈশব-মিলনের আমোদ কালে যদি সাংঘাতিক আমোদে পরিণত হয়, তজ্জন্ত দায়ী মঞ্জুর মাতা—না এই অবোধ বালক-বালিকা !

হঠাৎ একদিন মঞ্জুরাদেব বাড়ীর ছাদে কাঁচা বাঁশের মাচা বাঁধা এবং গো-শকটে হোগলার আমদানী দেখে পিণাকি মঞ্জুরকে জিজ্ঞাসা ক’রে জান্লে—তার দিদির বিয়ে। পিণাকির মাতা-পিতা এ ভোজে নিমন্ত্রিত হউক আর নাই হউক সে অবশ্য এ ছুরি-ভোজনের নিকট ব্যবস্থা হইতে বাদ পড়িবে না জানিয়া মঞ্জুর অলক্ষ্যে মনকে একবার নাচাইয়া লইল। মঞ্জুর পিতা অনেক কষ্টে এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া ‘গেডেটে’ব ‘লিভে’ব ফর্দে নাম উঠাইয়া বিবাহের দু’দিন পূর্বে কনিকাতায় হাজির হ’লেন।

বিবাহের রাত্রে পিণাকির উপর জল পরিবেশনের ভার পড়িল। সে নির্ঝিচারে জলের ‘জাগ্’ হস্তে রাজি বারটা অবধি ভক্ত-নিমন্ত্রিতগণ হইতে ব্যাণ্ডওয়ালাদের ব্যাণ্ড-বাহকের কাছ পর্যন্ত

## “জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

ঘুরে মঞ্জুবার পিতার ভোজন দায়ের শেষ-রক্ষা করেছিল। অল্প যে কোন বিষয়েই তৌক, পানীয়ের অনাটন সম্বন্ধে বরষাত্রা কোনরূপ কৃৎসা রটনা করিতে সাহস করে নাই।

যখন আর কাহারো কষ্ট ভিজাইবার দরকার রহিল না তখন পিণাকি অন্তঃসন্ধান করিয়া বিশ্রামের জন্য একটা শূন্য ঘর খুঁজিয়া নষ্টল, সেটা মঞ্জুবার পিতার ঘর। এমন সুসজ্জিত কক্ষে সে একা আধিপত্য করিতে কখনও পায় নাই। তাই আকাঙ্ক্ষাটা মিটাইবার জন্য সে সেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরে অগাধ ত্রব্যের সহিত ছিল একটা ইঞ্জি-চেয়ার, একটা গড়গড়া আর বিছানা-সমেত একটা খাট। পিণাকি নিঃশব্দচিত্তে দরজা ভেজাইয়া দিয়া, পাখা খুলিয়া ইঞ্জি-চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাল্য-ক্লেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার গতি যতদূর সম্ভব, পিণাকির চিন্তা ততদূর প্রবাহই অগ্রসর হইয়াছিল। তার চিন্তা কল্পনা-রাজ্যের সীমান্তে গিয়া যখন ধাক্কা খাইল, তখন হঠাৎ গড়গড়ার নলটার প্রতি তার দৃষ্টি পড়িল। কাল বিলম্ব না করিয়া সে কর্তা ব্যক্তির অহরূপে পায়ের উপর পা তুলিয়া, বক্ষে চিবুক স্পর্শ করাইয়া কিরূপ গাঙ্গীতের রূপ অহরূপে ব্যর্থ হইয়া কলিকালুত গড়গড়ায় টান দিল—গুড়ুক—গুড়ুক—গুড়ুক—গুড়ুক।

সে শব্দ বিবাহ বাড়ীর কোলাহলে আর কাহারো কর্ণে পৌছিল না বটে, কিন্তু মঞ্জুবার ঘুম আঘাত খাইয়া মঞ্জুবারে জাগাইয়া দিল।

## অরগোল্লাস

সে যে এই ঘরেই শুইয়া ছিল তাহা পূর্বে পিণাকির দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যখন অবাকনেত্রে মঞ্জুষা পিণাকির দিকে দেখিতেছিল তখন ‘দোসরে’র দৃষ্টিতে বিচলিত না হইয়া পিণাকি সপ্রস্তুত ভাবেই কহিল, “এই যে গিন্নি, এর মধ্যেই শুয়ে পড়ো ?”

ইতিপূর্বে গৃহিণী সম্বোধন মঞ্জুষা কাহারো নিকট হইতে পায় নাই, তাহ এত বড় একটা পদবীদাতার প্রতি শ্রদ্ধায় তা’র মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, “হাঁ, তুমি কখন এলে ?”

সরলার সরল কণ্ঠের উত্তরে আশ্চর্য হইয়া এবং মঞ্জুষাকে নিভৃত নিকটে পাইয়া একটা প্রেম্যভিনয়ের কল্পনা পিণাকির উর্বর মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠিল।

“আর ভাই গিন্নি, তুমি তো আর খোঁজ নাও না—” বলিয়া পিণাকি ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া মঞ্জুষার পাশে গিয়া বসিল। মঞ্জুষা একটু সরিয়া বাইতেছিল, পিণাকি তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “একি ! কর্তা কাছে এলে বুঝি গিন্নি সরে যায় ?”

শ্রীল্‌ শ্রীযুক্ত কর্তা পিণাকিভূষণ প্রণয়ের জ্ঞান অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিল, তাই সেটা অনভিজ্ঞা মঞ্জুষার নিকট যথাসাধ্য ব্যাখ্যাশেষে কর্তা-গিন্নির পালা আরম্ভ করিয়া দিল। পিণাকি কহিল, “গিন্নি, আর তো পারি না, সারাদিন সংসারের জন্ত খেটে-খেটে কোমরে

## “জীবনে যত পুজা হলনা সারা—”

ব্যথা হয়ে গেল ; কেউ একটু হাত বুলিয়েও দেয় না। আমি না বলেও কি ইঞ্জির উচিত নয় ষোয়ামীর সেবা করা !”

হাজার-হাজার ভাঁড়ে হেঁট হইয়া জল পরিবেশন করিয়া সত্য-সত্যই পিণাকির কোমরটা ব্যথা করিতেছিল।

মঞ্জুর ক্ষুদ্র মুখে সে কথার উত্তর জোগাইল না। সে নিদ্রা-জড়িত চক্ষে যা’ হোক করিয়া পিণাকির কোমরে হাত বুলাইতে লাগিল। ইতি মধ্যে কর্ত্তা-গির্জিতে সংসার-ধর্ম্মের অনেকানেক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। সে কথা শুনিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই, কেননা সে আলোচনা প্রতি নিয়ত আমাদের হাড়ে হাড়ে চলিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোমরে হস্ত-সঞ্চালনের গতি মন্থর অস্থূভব করিয়া পিণাকি ফিরিয়া দেখিল—মঞ্জুরা ঢুলিতেছে। এ শ্বশ-বাসরে :ঞ্জুরা ঘুমাইয়া পড়িলে শ্রোম-লীলার একটা অঙ্গহানি হয় ভাবিয়া পিণাকি তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, “ওহো, একটা বড় কাজ আমাদের যে ভুল হয়ে গেছে।”

নিদ্রার তাড়নায় মঞ্জুরা শ্রদ্ধা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। সে কহিল, “আবার কি কাজ এখনও বাকী ?”

পিণাকি চট করিয়া বলিয়া দিল, “চুমু খাওয়া।”

মঞ্জুরা কহিল, “খ্যাৎ।”

এ কাজটা প্রমাণ দর্শাইয়া বোঝান পিণাকির পক্ষে একটু

## মরণোন্নাস

শক্ত। সে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কর্তৃত্ব দৃষ্টান্ত জোগাড় করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার বাক্য-ই যে বেদবাক্য এবং কর্তার কথা গৃহীতর অবশ্য পালনীয় জানাইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, “এটা কি আর একটা নূতন কথা ! যেখানে যত বর-বউ আছে সকলেই খায়।”

মঞ্জুষা মনে-মনে ভাবিল,—এ সমস্তার সমাধান করিতে তাহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। টাট্কা নূতন বর-বধু যখন তাহাদের বাড়ীতেই, তখন কল্য দিগিকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে সব বুঝিতে পারিবে।

সে পিণাকিকে কহিল, “আচ্ছা, খেতে রাজী আছি, কিন্তু তোমার কথা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে আর কখনও তোমার সঙ্গে কথা কইব না।”

“আচ্ছা তখন ক’য়োনা”—বলিয়া পিণাকি মঞ্জুষার মুখের সন্নিকটে নিজ মুখ অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিল, “খাও।”

মঞ্জুষা একবার মুখটা বাড়াইয়া দিয়া পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া কহিল, “না, লজ্জা করে।”

পিণাকি কহিল, “বরকে বুঝি বউয়েব লজ্জা করিতে আছে!”

মঞ্জুষা মুখ নীচু করিয়া অম্পট স্বরে বিনাইয়া-বিনাইয়া কহিল, “আগে তুমি খাও, তারপর আমি খাব।”

মঞ্জুষার সদ্-যুক্তিতে অগ্রপশ্চাত্য দৃষ্টি-নিষ্কেপ করিবার অবসর

## “জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

আর পিণাকির হইল না। তাহার বহুদিন-বাহিত এই অ-পূর্ব-প্রাপ্ত মুখ-রোচক ‘চিঙ্ক’টাব আশ্বাদ গ্রহণে সে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না। তাহার পর মঞ্জুষাকে কহিল, “নাও, এইবার হোমাব পান।?”

মঞ্জুষা ইতস্ততঃ করিতে করিতে দুই-চারিটা ঢোক গিলিয়া পিণাকির ঘর্ষাভিষিক্ত নোন্ডা গালে যে মুহূর্ত্তে আপন চৌটি ঠ’টী স্পর্শ করাইয়াছে অমনি কক্শকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “মঞ্জি!”

ফণেকের জন্ম উভয়েরই হৃদ-স্পন্দন হঠাৎ খামিয়া গেল। মঞ্জুষা প্রথমে সভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—ক্ষীতলোচনা পিসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান।

মহাভারতের যুগ হইলে পাণ্ডু-রাজের মত এমন নিবিড় স্থা-বেশ ভঙ্গ করার দায়ে পিসিয়াও যে অভিশপ্ত হ’তেন—সেটা ‘নঃসন্দেহ’।

চুলের ঝুঁটি ধরে বিছানা থেকে নামাইয়া পিসিয়া তো মঞ্জুষাকে টানিতে-টানিতে ঘরের বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। প্রত্যাংপন্নমতি ‘পিণাকিও আর অধিক স্বেযোগের অপেক্ষা করিল না,—একলক্ষ্যে নিজেদের বাটার দ্বারে হাজির।

## অরণোন্মাস

( ২ )

কাল—দশ-বারোটা বছরকে গ্রহি দিয়ে শিকেয় তুলে ফেলেছে। এখন পিণাকি ও মঞ্জুবা উভয়েই বিশ্ব-বিজ্ঞানঘের পাঠ্য-পুস্তক ঘোমটনে ব্যাপৃত ও ব্যাপৃত।

পিণাকিদের একটু ইতিহাস দরকার।

তাদের আদি নিবাস ছিল—ভাটপাড়ায়। পিণাকির পিতা তত্রস্থ কোন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন, নাম—বিপিন চন্দ্র... তর্করত্ন কি বিজ্ঞারত্ন সেটা ঠিক মনে নেই। বছর ত্রিশ পূর্বে খুব সম্ভবতঃ অর্থলোভে কলিকাতার কোন ধনীৰ বিধবা কন্যার বিবাহে পৌরহিত্য করায় তিনি নাকি সমাজ-চ্যুত হয়েছিলেন। ভাটপাড়া থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি কাঁটালপাড়ায় গঙ্গাতীরে আশ্রয় বেঁধেছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।—পাটকল ওয়ালাদের জমি জরিপের ফিতায় সে আশ্রয়টীও অবিলম্বে বাধা পড়লো।

নিরুপায়ের উপায় হরিকে স্বরণ করে নিরাশ্রয় —রত্ন মহাশয় যখন সপরিবারে উক্ত ধনীর শরণাপন্ন হ'য়ে বসেন, “এখন উপায় ?” তখন ধনী মহোপকারকের ঋণ স্বরণ করিয়া আপনার কলিকাতাস্থ একটা ভাড়াটিয়া বাটীর নিয়তলার কিয়দংশ ছাড়িয়া না দিয়া আর করেন কি ?—তবে মাত্র —রত্নমহাশয়ের যাবজ্জীবন বাসের অজুহাতে।

## “জীবনে যত পুজা হলনা সারা—”

পিণাকির জন্ম—এই বাটারই একটা অঙ্কুশে ।

মাহুষ যে স্থানে জন্মায় সেই স্থানের আবহাওয়াতেই তাব প্রকৃতি গড়িয়া উঠে । পিণাকির পিতা পিণাকিকে ‘শ্রুতি’-‘স্মৃতি’তে ডুবাইয়া তাঁহারই মত একটা রত্ন গড়িয়া তুলিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নাট । ‘সইভ্য-ভইবো’র যুগে পণ্ডিত-জ্ঞানে মহত্বের কোন উপাদান নাই বুঝিয়া পিণাকি পিতার অনিচ্ছা-সম্বোধ পারিবারিক দৌর্বল্য অগ্রাহ্য করিয়া তথ্য-কথিত সভ্যশ্রেণী মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিল

শোভাবাজারের ‘তরুণ-ব্যায়াম-মণ্ডলী’ হইতে খিদিরপুরের ‘ছাত্র-নাট্য সম্প্রদায়’ পর্য্যন্ত কোথাও তাহার যাতায়াতের বাধা ছিল না । ট্রামে-বাসে উঠিলে সকলেই তাহাকে—“এই যে পিণাকি বাবু।” বলিয়া নমস্কার করে ।

সে দিন বিবহার ।

ট্রামের মাছলী টিকিট-খানা চেয়ে নিয়ে সারাদিন এধার-ওধার গু’ব ‘ঝড়ো কাকের মত’ যখন পিণাকি বেলা তিনটার সময় বাড়ীতে এসে চুকলো, তখন তা’ব মা বসেন, “হ্যাঁয়ারে, কুস্তি-খিয়েটার ক’রেই কি পেট ভরবে ?”

পিণাকি মাতার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, “সে সব আরি জার্নিনা ;—বড় কিদে পেয়েছে, এখন খেতে দাও ।”

মাতা ক্ষুধাতুর পুত্রের সম্মুখে শশব্যস্তে বাড়ী-ভাতের ঝালা



## মরণোন্মাদ

আনিয়া দিলেন। পুত্র খাইতে আরম্ভ করিলে মাতা কহিলেন,  
“পিণাক্, একটা কথা বলবো শুনিবি?”

“কি?”

মাতা আম্হা-আম্হা করিয়া বলিলেন, “এই একটা  
বিষয়ে-টিয়ে—”

“বুঝ্তে পেরেছি,—আমার বিষের জন্তে তো বলছ?”

আনন্দোৎক্লম্ম মুখে মাতা বলিলেন, “হাঁ বাবা, বিষের  
উপযুক্ত বয়স হ’ল তো?—তাই বলছিলাম, এখন আর বিচ্ছেদ না  
করলে কি ভাল দেখায়?”

“তা তো জানি, কিন্তু লেখা পড়া করতে হ’বে, না—বিষে  
করেই আমার দিন কেটে যাবে?”

“না, তা’ বলিনি, এই বারের পাশটা দিতে হো’তোর আর  
ছ’মাস বাকী? তারপরে—”

“তা’ সে তো এখনও দেবী আছে।”

“আহা কথাবার্তাগুলো ত সব আগে থেকে ঠিক করতে  
হ’বে?”

“কাদের সঙ্গে ঠিক করছো?”

বিবাহের প্রস্তাবে এইবার বুদ্ধি পুত্রকে সম্মতি করাইতে  
পারিলেন ভাবিয়া মাতা কহিলেন, “খাসা মেয়েজী বাপু,—তোরা  
সাক্ষাৎ মানাবে।”

“জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

“মেয়েটা কে তাতে শুনলুম না ?”

মাতা দশমুখে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন,—“মেয়েটি বাগবাজারের বিত্বেলকারের মেজ মেয়ে। বিত্বেলকারের মত পরসাগ’লা লোক কি আর আমাদের জাতে খুঁজে পাওয়া যায় ? আশী ঘর তার বজমান ! কলকাতা সহরেই তা’র তিন-তিনখানা বাড়ী। বিয়ে হলে পরে আমাদের একটা হিলে হয়ে যাবে। দেখছি ন্তো কি ক’রে মাথা শুঁজে সব আছি—‘হুট্’ করলেই ঠুঁতে হ’বে। অত বড়লোক, বিয়ে হলে কোন না একপানা বাড়াই জামাইকে দেবে ! তা’হলে একটা শুভদিন দেখে কিছু দিয়ে মেয়েটা আট্কে রাখা যাক—কি বল ?”

“মেয়েব বয়স কত ?”

“তা’ আমাদের জাতে কেউ দোষ দিতে পারবে না বে এমটা গেডে মেয়ে এনে হাজির করেছে। সবে এই সাতে চলছে, গোঁরীদান করবাব জন্তু বিত্বেলকারের একান্ত ইচ্ছে।”

মাতার কথা আন্তোপান্ত শ্রবণান্তর পিণাকি ক্র-ব্দ কুক্তিত কর্ণায় কহিল, “দেখ মা, তোমরা লোকের কাছে আগে কথা দিয়ে বৃথা অপমানিত হ’য়ো না। আমি ত আপাততঃ বিয়ে করবো-ই না। ঠিক করেছি, যদি কখনও করি সে নিজের পছন্দমত, কারণ যখন সজে চিরকাল ঘর করুতে হ’বে তাকে নিজে পরখ করে নেওয়াই ভাল। তোমরা হয়ত এখন যা’ হোক দেখে একটা জুড়ে দেবে

## অরপোজাস

তারপর তোগাদের অবর্ত্তমানে নিজের অবিবেচনার ফলভোগ  
করতে হবে—সেই আমাকে। তাই তোমাদের বারণ করে দিচ্ছি  
—অনর্থক চেষ্টা ক’রো না।”

এস্রাজের টানা-মীড় ল্পথ হইয়া গেল। আপনাদিগের দারিত্রের  
কথা স্বরণ করিয়া পিণাকির মাতার নয়ন কোণে অশ্রু দেখা গিল।  
ভবিষ্যতের স্থখ এবং বর্ত্তমান দুঃখের দ্বন্দ্ব পড়িয়া তিনি আর  
একবার পুত্রকে নম্র-ভাবে কহিলেন, “নিজের অবস্থাটা একবার  
ভেবে দেখিস্—পিণাক্ !”

পিণাকির দায় পড়িয়া গিয়াছে। দিবসের বিশ ঘণ্টা কাল  
বাহিরের আনন্দ-কোলাহলে কাটাইয়া দুঃখ চিন্তা করিবার অবসর  
আর তাহার কোথায় ! মাতার অশ্রুজল দর্শনে স্থখের কল্পনা-ক্ষেত্রে  
আবাদ বন্ধ হইতে পারে ভাবিয়া পিণাকি মাতার দিকে না চাহিয়া-ই  
উঠিয়া গেল।

\* \* \* \*

“হ্যালো, গুড্-ইভনিং।”

“এই যে মঞ্জুবা !—তোমার কাছেই যাব ব’লে ভাবছিলুম।”

“ওঃ। মাই গুড্-লাক্—তাই নাকি ! সকালে যে বজ্র তপ্পন  
আসব—খুব তো এলে ?”

“সে জ্ঞাত—বেগিং পার্ডন্, মঞ্জুবা।”

“কেন তপ্পন-বেলা কি হয়েছিল ?”

“জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

“বিশেষ কিছু হয়নি” বলিয়া পিণাকি পকেট হইতে একটা ‘ক্রচ্’ বাহির করিয়া মঞ্জুয়ার কাপড়ে আটকাইয়া দিল।

মঞ্জুয়া বলিল, “এ আবার কোথা থেকে পেলো ?”

পিণাকি নিউ-মার্কেটের একটা দোকানের বিল বাহির করিয়া কহিল, “ওঃ, এই দেখনা—সাবা চপ্পর এইটার ভুলে ঘুরে বেড়িয়েছি।”

মঞ্জুয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অশ্রুচক্ষুরে কহিল, “কি দরকার ছিল ?”

“সে যাকগে,—আজ একটা নূতন কথা আছে বলবো। সেটা শুনল নিশ্চয়-ই হাসতে-হাসতে তোমার দম আটকে যাবে।”

সন্ধ্যার কালো-পর্দা ধীরে-ধীরে কলিকাতাকে জড়াইতে আরম্ভ করিল। কোজাগরী-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উপভোগের অংশ উভয়ে-ই ত্রি-তলের ছাদে উঠিল।

মঞ্জুয়া কহিল, “কি নূতন কথা বলবে বলছিলে—এইবার বল।”

পিণাকি মঞ্জুয়ার উভয় স্বক্ষে হস্ত রাখিয়া বলিল, “শুনে ?—  
শুনে ?—আমার বিয়ে।”

“যাও, চালাকি ক’রো না।”

“বিশ্বাস করছ না ?—সত্য-সত্যই বলছি। মা বা’দের বাড়ীতে একটা হজমী গুলির মত মেয়ে দেখে এসে আমায় ধরে বসেছেন—  
বিয়ে করতে হ’বে।”

## মরণোন্মত্ত

“তুমি কি বললে?”

“আমি আমার বাঁধা-গৎ আউড়ে দিলুম”

“ঠিক বলছো—তুমি রাজী হওনি ত?”

“মঞ্জুষা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর! যে প্রাণ একবার উৎসগিত হয়ে গেছে সে প্রাণ কি আর কাউকে দেওয়া যায়?”

পিণাকির গলায় বাহর মালা পরাইয়া দিয়া মঞ্জুষা কহিল, “ন’, সে কথা আমি বলিনি, তুমি আমায় মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস ত, আমি জানি।”

পিণাকি আবেগে মঞ্জুষাকে বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া কহিল, “মঞ্জুষা, এমন বন্ধনে যেন চিরকাল আমরা বাঁধা থাকতে পারি।”

“নিশ্চয়-ই থাকুবো। আমাদের এখনকার এই পূর্বরাগ দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন-বন্ধন যে অধিকতর দৃঢ় হ’য়ে উঠবে তা কি তুমি জান না? যে লতা বাল্য হ’তে বিটপীতে জড়ান তা’র শিকড় যে বিটপীর প্রত্যেক শাখায়-শাখায় গঁথে বায়,—শত প্রলয়ের ঝটিকাতোও সে ত ভুলুটিতা হ’বার নয়।”

পিণাকি নিঃশব্দে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “সেট তোমার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করছে। আমায় বাধা দেব’র কেউ নেই বটে, কিন্তু তোমার বাধা বহ।”

“আমার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশটাকে তারা বাধা দিতে পারে, কিন্তু মনোভাব ত তারা দমন করতে পারবে না।”

## “জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

“তোমার অন্তর্নিহিত ঐ মনোভাবটুকু বজায় রেখো মঞ্জুষা।—  
ওর দ্বারাই আমাদের ইচ্ছা নিশ্চয় পূরণ হ’বে।” বলিয়া পিণাকি  
মঞ্জুষার গণ্ডস্থলের কিয়দংশ লাল করিয়া দিল।

দ্বি-তলের তাড়াটির আর অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র-কন্যা ছাড়ে খেলা  
বরিতেছিল, তাড়াটীয়া গৃহিণী স-রোষে ডাক দিলেন, “ওরে  
ভোঁদা, রাগ,—ওখান থেকে শিগগির ঘরে চলে আয়।”

( ৩ )

মানুষের গানের সহিত ভগবানের তাল সমান ভাবে বেতে  
পারে না, অধিকাংশ স্থলে-ই কেটে যায়। ষ্ঠৈত-চাকল্য দোলায়  
দোড়ল্য নাচত্বের মন প্রথমাবস্থায় অল্পতাপ করে, পরিশেষে অবৈত-  
জ্ঞানে পরিত্রাপে জর্জরিত হয়। শরতের নির্মল-আকাশ দেখে  
মন হয়, চিরকাল-ই বৃষ্টি এইরূপ থাকবে, কিন্তু আঘাতে কোথা  
থেকে কালো মেঘ ঠিক এসে হাজির হয়!

পিণাকির পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলাফলের আশায়  
কয়দিন উদগ্রীব হইয়া সে ছুটছুটি করিয়া খবর পাইল—পরীক্ষায়  
সে কৃতকাব্য হইতে পারে নাই।

এই অকৃতকাব্যের জন্ত বাড়ীতে তাহাকে দু’কথা বলিতে কেহ  
সাহস করিবে না, বলিলেও তাহা তাহার পক্ষে তত পীড়াদায়ক  
নহে। কিন্তু যখন তাঁ’র ভাবী বধু মঞ্জুষা একথা শুনিবে তখন—!

## শরণোত্তাল

পিণাকি বাটীতে ফিরিয়া আস্তাগত কহিতে লাগিল, “মঞ্জুষাকে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব ? সে কি আর তেমন করিয়া আমায় ভালবাসিতে পারিবে।”

ধীরে-ধীরে মঞ্জুষার সরসিজ-সদৃশ মুখ পিণাকির নয়ন সরোববে ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ-জ্যোতিঃ পরিপার্শ্ব অঙ্কবান দূরে সরাইয়া দিল। অতীত-স্মৃতি-শিখা নির্ঝাণোন্মুখ বর্তমানে ইন্ধন লাগাইয়া পিণাকিকে পুনরায় ভাবাইল,—ভালবাসা ত বাহিরের জিনিষ নয়। প্রাণঘণীর নিকট প্রাণঘণীর শত অপরাধ যে মার্জনীয়,—দোষ ত তার দোষেতে পায়না এবং দেখিতে চায়-ও না। বিরহিণী নিত্য-বিরহেব জ্বালাতে-ই ত জর্জরিতা, অথু কিছু ভাববার ত ত,ব অবসর নাই। তুষ্কার্ভের দৃষ্টি ত উপদেষ্টা ভোজ্যে নয়,—পানীয় আভিমুখ্য। না, মঞ্জুষা তাহাকে কখনই হীন চক্ষে দেখিবে পারেনা। যদি দেখিত, তাহা হইলে তাহাদের দারিদ্র্যবস্থা দর্শনে সে পূর্বেই আভিজাত্য-গর্বে ফিরিয়া দাঁড়াইত। অথ, গুণে সৌজন্মে, রূপে ত ভালবাসা নয়,—ভালবাসা যে মনের সংযোগে। এক অদৃশ্য-সুত্র যে ভালবাসাকে বেঁধে রাখে,—সে ত ছিন্ন হ'বার নয় !

সেই চাঁদিনী রাতের নিরলা ছাদে মঞ্জুষার মনোভাব বজ্রাঘেব কথা পিণাকির মনে পড়িল। প্রাণ তার ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বাহিরের দরজার নিকট আসিয়া পিণাকি মঞ্জুষার নিকট

“জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

যাইবার চিন্তা করিতেছে, এমন সময় মঞ্জুস্বামীর সরকার আসিয়া তাহার হাতে একখানি লাল খামে মোড়া চিঠি দিয়া গেল। পিণাকি বহু খামখানি দু’একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। সে ঠিক করিতে পারিল না যে, মঞ্জুস্বামীর বাটা হইতে কোন্ শুভ-বার্তা-জ্ঞাপক পত্র আসিতে পারে! সংশয়ের ছায়া তা’র মনোমধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। সেটাকে সে সবলে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নাছোড়-বান্ধা যা’বার নয়,—ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এককথাই তোলে! এ কি জালা!—এত করিয়া সে বলিতেছে—না, তবু বলিবে—হাঁ! যদি সত্যি-ই তাই হয়, হৃদয় ও আঘাত ও সঙ্করিতে পারিবে না!—চিঠি খুলিয়া দরকার নাই।

কিন্তু চিন্তালোভিত বিক্ষুব্ধ মন যে সংশয় দোলায় দুলিতে চাহে না, সিদ্ধান্ত দে তার চাই। চিঠি খুলিয়া গেল, তা’তে লেখা :—

আগামী ৬ই বৈশাখ রবিবার শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রকান্তের সহিত আমার ধানটা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জুস্বামীর শুভ-পরিণয় হইবে। অতএব মহাশয় উক্ত দিবসে সবাঙ্কবে মদীয় ভবনে শুভাগমন করতঃ শুভ-বাখ্যাতি সন্মিলন করাইবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি নাকরুনা করিবেন।

বশব্দ—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।



## অরণোন্নাস

চিঠিখানি সম্পূর্ণ পিণাকি পড়িতে পারিল না। ভাত্রেয় পুষ্করিণীর মত কাণায়-কাণায় অশ্রু ভরিয়া চোখ তার বাপসা হইয়া গেল। অলক্ষ্যে চিঠিখানি তাহার হাত হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল।

সে ভুল দেখে নাই ত। সে বুঝাইতেছে—না, জাগিয়া আছে। জাগিয়া আছে বৈ কি!—এই তো সে কণাটে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া। পুনরায় সে চিঠি উঠাইল, ভাল করিয়া চক্ষু মার্জন করিয়া আবার পড়িয়া দেখিল। না, তার দৃষ্টি বিভ্রম বা চিন্তাবিকার তো হয় নাই,—ঠিকই দেখিয়াছে। সত্যই মঞ্জুবার বিবাহ।

পিণাকি চিঠিখানা লইয়া আপনার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেল। সে যতই চিন্তা করিতে থাকে, অন্ধকার ততই যেন ঘনাইয়া আসে। ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত আক্ৰোশ তা'র যাবতীয় গৃহসামগ্রীর উপর পড়িল। একটু সামান্য আশায় সে যে দিকে তাকায় সেই দিকই যেন তাহাকে অট্টহাস্তে বিদ্রূপ করে। গৃহে পাঠ্য পুস্তক, চৌকী ছবি, কুঁজো, খালা, ঘটি, তোয়াক, পেটরা,—সবই যেন অঙ্গুলি সঞ্চালনে তা'র জীবনের ব্যর্থতাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে। মঞ্জুবার এই চাতুরীতে বিশ্বের নারীর প্রতি তাহার ঘোর বিবেচনা হইল,—সমগ্র সংসারটাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে হইল। একখানা পুস্তকের মধ্য হইতে মঞ্জুবার একটা ফটো বাহির করিয়া তৎপ্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া সেটাকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া

## “জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

দিয়া, নিমন্ত্রণ পত্র হইতে ‘৩ই বৈশাখ রবিবার’ কথাটি সে একটুকরা কাগজে টুকিয়া লইয়া গকেটস্থ করিল।

বস্তুতঃ এ বিষয়ে মঞ্জুয়ার কোন দোষ ছিল না। দেবেন বাবু কোনসূত্রে এই গুপ্তপ্রণয়-ঘটিত ব্যাপারের আভাষ পাইয়া মর্মাহত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক কষ্টের পর শিবপুত্রের নূতন সার-ডেপুটি শ্রীমান চন্দ্রকান্ত বাবাজীবনকে পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলে, মঞ্জুয়া অনেক আপত্তি তুলিয়াছিল; এমন কি পিতৃকবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিষপান প্রভৃতি দ্বারা জীবলীলা ‘সাপ’-বিবার ভীতিপ্রদর্শনও করিয়াছিল। কিন্তু পিতার কড়া পাহারায় কিছুই টিকিল না। দেবেন বাবু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—পিণাকির সহিত তাহার বিবাহ কোন মতেই হইতে পারে না।

\* \* \* \*

মঞ্জুয়ার বিবাহের দিন।

চারিদিকে হটগোল, গাভীঘোড়া, ভিড়ানের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। নবনিশ্চিত নহবৎখানা হইতে সানায়ের স্বর উঠিতেছে, আর সে স্বর আশুনের হকার মত ছুটিয়া পিণাকির সর্বোচ্চ বেগে ফোঁস করিয়া দিতেছে।

মাতার তাগিদে পিণাকি পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া, সিন্ধের চাদর ঝোলাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বাহির হইল, কিন্তু মঞ্জুযাদের দ্বারদেশের সম্মুখস্থ হইয়া আর প্রবেশ করিতে পারিল না।

## মরণোক্তাস

সেইস্থান হইতেই সে দেখিতে পাইল—ঠাকুর দালানে হোমান্নি জলিতেছে এবং তৎসম্মুখে উপবেশন করিয়া একটি রূপবান্ সুবক মঞ্জুষার পট্টবস্ত্রের অবশেষে উঠাইয়া সীমন্তে সিন্দূর লেপিয়া দিতেছে।

পিণাকি আর চাহিতে পারিল না। তাহার মনে হইল যে, সে ভোর করিয়া গিয়া ঐ লাল সিন্দূরটা মুছিয়া দিয়া আসে, কিন্তু মাথা বিগড়াইয়া লাভ ?

চলুক, স্তব্ধে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল—কেন ভগবান চলুক স্তব্ধে ঐরূপ রূপ নিয়ে এই অসময়ে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। যদি তুল বসিয়াই তাহাকে পাঠান হইয়া থাকে, তবে জন্মিয়াই কেন সে মরে ন, হ ?

পিণাকির আর অধিকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়। এ উদ্বেজনা কে বশ করা মাহুষের সাধ্য নয়। আমারকে তোমার হইতে দিতে পিণাকি ও পারিবে না ;—হয়ত এখনি কিছু অনর্থ ঘটিলে।

তবে উপায় ?—উপায় আত্মস্থ হওয়া। পিণাকি নিমেষে মূণ কিরাইল। তাহার আশা-আকঙ্ক্ষা, মাতা-পিতা ঘর-বাড়ী, যাহা কিছু সমস্তই পিছনে পড়িয়া গেল, আর কিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইল না। সম্মুখে দেখিল—বিশাল অনন্ত !—তাহাতেই পা বাড়াইল।

## “জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

গৈরিকবস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক পিণাকি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাশীতে এক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।  
বারো বৎসর ধরিয়া বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-সাংখ্য-দর্শন প্রভৃতি চর্চা ও অঙ্কণীলনের পর সন্ন্যাসী তাহাকে জন্মভূমি নন্দনার্থ আজ্ঞা করিলেন। পিণাকি পুনরায় কলিকাতার পথ ধরিল।

এতদিন সাধু-সংস্রব এবং শাস্ত্রালোচনার মধ্যে থাকিয়া জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত পিণাকি আপনাকেও হারাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার পথে বিস্তৃত পূর্ব স্বতির সহিত পুনরায় মিলিয়াও প্রতিচ্ছবিও তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল।

কেন এমন হইল? স্মৃতি কি এতই স্বার্থপর—বার প্রভাব একটা যুগেব সাদন ব্যর্থ করিয়া দেয়! কে ইহার উত্তর দিবে?  
—মন?

পিণাকি আপন মনের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিল—তা’র দেহ দৈনিক বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু মনের কাপড় এখনও যে তার পরিবর্তিত করা হয় নাই।—মনেরও গৈরিকাক্ষয়ন প্রয়োজন।

যাক, কলিকাতার আসিয়া পিণাকি তাহাদের ব্যসা-বাড়ীটি খুঁজিয়া পাইল না। অল্পসঙ্কানে জানিল,—তাহা ধূলিসাৎ করিয়া ইনফ্রভেন্ট ট্রাষ্ট নূতন রাজপথ নির্মাণ করিতেছে। অগত্যা তাহাকে সন্ধ্যার পর নিমতলা ঘাটে গঙ্গাতীরে শয়ন করিয়া থাকিতে হইল।

## অরণোত্তর

রাত্রি বোধ হয় তখন বায়োটা হইবে, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে পিণাকি দেখিতে পাইল,—জলের খুব সন্নিকটে বসিয়া জনৈক। স্ত্রীলোক নাকিস্নরে ক্রন্দন করিতে করিতে অপর একজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা যুবতার দি'খির সিন্দূর উঠাইয়া দিতেছে। কৌতূহলাক্রান্ত পিণাকি তাহাদেরই জনৈক পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা,—দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কন্যা; নান,—গজুয়া। বিবাহ হওয়া অবধি সে স্বত্তরালয়ে বাইতে চাহিত না, জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলেও পলাইয়া আসিত। আজ টেলিগ্রাম পাইয়া জানা গেল—জামাইবাবু বৈকালে গতাস্ব হইয়াছেন।

পিণাকি আর শুনিতে চাহিল না। সে “বম্ বম্” শব্দে দিগ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া বলিল,—“বিশ্বনাথ! অবিমুগ্ধকারিতায় বাল্যরাগ ও পূর্বরাগের প্রকৃত মূল্য না বুঝে তা' নিয়ে চিরদিন ভিনিমিনি খেলেছি, কিন্তু আজ যখন তোমার বিচিত্র ইচ্ছিত দিয়ে তা' বুঝিয়ে দিলে, তখন আমার এ জীবনের শেষ সম্বল ‘অমুরাগের ডালি’ আজ তোমার চরণেই সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে দত্ত হ'লুম।”

## পাগল

অদূর পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র নগণ্য হিন্দুস্থানী হয়েও রামদীন বাজলায় এসে নিজের চতুর্দিকে ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের পনি খুঁড়ে নিয়েছিল—যেদিন বছর-বছরের সাগ্রহ-প্রতীক্ষা সকল ক’রে সরলার শূন্য কোল পূর্ণ হ’ল।

স্বয়মা জন্মবার পূর্বে রামদীন নিজেকে মূল্যহীন বলেই মনে ক’রত। সারা দিনমান সে একটা না একটা কাজে লেগেই থাকত, —চূপ ক’রে বসে থাকতে তাকে খুব কমই দেখা গেছে। দিনান্তে এত কাজ ক’রেও সে যেন তার কাজের সমাপ্তি খুঁজে পেত না— ভগ্নিও হ’ত না।

রামদীনের বয়স প্রায় তিন-কুড়ির উপর হবে। ত্রিশ বছর বয়সেই তার স্ত্রী-পুত্র সব মারা যায়; কেবলমাত্র একটা আট বছরের মেয়ে তাকে আরও কিছু দিন তার মূল্যকে মায়ার বাধন দিয়ে আটকে রেখেছিল। সেটাও কেড়ে নিয়ে ভগবান যখন তাকে পথ দেখিয়ে দিলে তখন সে ঘুবতে ঘুবতে সরলার বাপের কাছে এসে ছুটেছিল।

## সরগোল্লাস

সরলার বিবাহের সময় শশুর-দত্ত অস্ত্রাস্ত্র যৌতুকের সঙ্গে স্বরেন্দ্রনাথ বামদীনটিকে পেয়েছিলেন।

স্বরেন্দ্রনাথের বাটীতে এসে পধ্যস্ত রামদীন সমস্ত কাজ সুচারু-রূপে এবং সুশৃঙ্খলভাবেই করত, কিন্তু স্বধর্ম জন্মাবার পর থেকে তাঁর সব কাজেই যেন একটা শৈথিল্য এসে পড়েছিল। এতদ্বারা স্বরেন্দ্রনাথের ক'ছ থেকে তাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার সহ্য করতে হ'ত, কিছু সেগুলো সে গায়ে মাথুতো না।

দিনেও রাত্রেই তাই-ঘণ্টা তাঁর স্বধর্মকে নিয়েই কাটতো। তা'বে হিন্দুস্থানী ধরণে কাপড় গড়ান, হিন্দি বুলি শেখান—এই গুলোই যেন তাঁর কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্বধর্মারও ছিল যেন রামদীন অস্ত-প্রাণ।

স্বধর্মাবে পেয়ে রামদীন তাঁর অসমাপ্ত কাজের সমাপ্তি খুঁজে পেলেন বটে, কিন্তু অতৃপ্ত মন তাঁর তৃপ্ত হ'ত না—আরও কিছু চাইছিল। সে স্বধর্মাকে সামনে বেখে তাঁর সঙ্গে ত্রিশ বছর পূর্বেকার মূল্যবোধ কতকগুলো ছবি মেলাবার চেষ্টা করতো, কিন্তু মিলতো না। সে ছবি মেলাতে এখনও দু'বছর অপেক্ষা করতে হবে, সত্যম্। এখন তবে ছয়।

(২)

দিনরাত চাকরের ঘরে বসে থেকে হীন মনোবৃত্তি শিক্ষা দোষণীয় মনে করে স্বরেন্দ্রনাথ সরলাকে ডেকে বললেন, “বার্ভার সব কাজেই

## পাগল

কি আমাকে চোখ রাখতে হবে? মেয়েটাকে কি একটু নজরে রাখতেও পার না? একটা মেয়ে,—তাও যদি না পাব, পাচটা হ'লে কি করতে? ও রকম ভাবে চাকরদের ব্যবস্থাকে আর যেতে দিও না।”

সরলা হাসিয়া উত্তর দিলেন, “রামদীন তোমার কাছে চাকর হতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওর যে একটা আলাদা সম্বন্ধ আছে। ও তো আর আজকের নতুন চাকর নয়,—স্বহ্মার প্রতি ওর ও যে একটা মত্ত দাবী আছে। শুধু স্বহ্মা কেন—আমিও বে তার হাতে মাছধ।”

স্বরেঙ্গনাথ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “ও সব বুঝনা। চলোকের মেয়ে যাতে ভয়ভাবেই গড়ে উঠে তার চেষ্টা করতে হবে। একটা হিন্দুস্থানী ‘মেড়ো’র কাছে আমার মেয়ে কোন দরতাই নাছধ হ'তে পারে না।”

সরলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, “তাহলে আমাকেও তোমার প্রত্যাশা করা উচিত হয়নি। রামদীনের কাছে আমিও বন্দন মাছধ হ'দছি তখন আমিও ত আমাছধ, অভয়।”

স্বরেঙ্গনাথ কোন উত্তর দিলেন না, শুধু হইয়া বসিয়া র'লেন।

সবলা স্বামীর একান্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া মৃত-স্বরে কহিলেন, “দেখ, দাড়াই হ'য়ে অত কঠোর হ'য়ো না। সন্তানের পিতা হ'য়ে



## মরণোন্মত্তা

সন্তান যে কি জিনিস সেটা একটু বুঝে দেখবার চেষ্টা ক'রো দেখি ? সেদিন রামদীন যখন তার নিজের মেয়ের গল্প করতে করতে বৈঠকে ফেললে,—তখন স্বামীর মুখটা কি তোমার একবারও মনে পড়ে নি ? তুমি কি মনে করছ যে সে পেটের জ্বালাতেই শুধু এইখানে চাকবী করছে ? স্বমাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে এই বুড়ো বয়সে সে কি আর বাঁচবে ? তুমি বোধ হয় জাননা যে স্বামীর অনিষ্টে আমাদের অপেক্ষা সে আরো বেশী বেদনা বোধ করে ।”

স্বরেন্দ্রনাথ ষষ্ঠীর হইয়া বলিলেন, “তার বোধ-অবোধে কিণ্ডা তার মরণ-বাঁচনে আমার কি এসে যায় ?”

স্বরেন্দ্রনাথের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সরলা হঠাৎ ক্রোধের সহিত কহিলেন, “তোমরাই না আজকাল দেশ উদ্ধার করতে ছুটেছ ? তোমরাই না পবাবীন, পরনির্ভর, পর-পদনিত জাতির ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করছ ?”

স্বরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “হাঁ, করছি,—তা’ এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ?”

“সম্বন্ধ ব'লেই । নিজের ঘরের মধ্যে একজন পরাবীনের মরণ-বাঁচন যখন তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে পার না, তখন সমগ্র পরাবীন জাতিকে তোমরা কোন্ শক্তি দিয়ে বাঁচাবে তা তো জানিনা ! ভিতরের সংস্কার আগে শেষ কর, তারপর বাইরের

## পাগল

কাজে হাত দিও।” স্বরেন্দ্রনাথ সরলার মুখের প্রতি নির্ঝাঁক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সরলা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “স্বাধীনতা হারিয়ে অন্তান্ত স্বাধীন দেশ দেখে তোমাদের যেমন স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা ভ্রোগে উঠেছে, ঠিক তেমনি কত্কা হারিয়ে কত্কালাভের আকাঙ্ক্ষায় আজ রামদীনের ক্ষয়পূর। তাই সেও পরাধীনতারূপে গড়া অপরাধ খেঁজায় বরণ করে নিয়েছে—তার বছরদিন সঞ্চিত অপত্যস্নেহ উৎসর্গ ক’রে একদিন মুক্তি পাবার জন্য। তার প্রবাহমান স্নেহ-স্রোত একদিন পথের মাঝে আটকে গিয়েছিল আজ সেই স্রোত আবার পথ খুঁজে পেয়েছে। তাকে বাধা দেওয়া কি উচিত?”

স্বরেন্দ্রনাথ অন্ত-মনে হইয়া রহিলেন, উচিত-অনুচিত চিন্তা করিতে লাগিলেন কিনা জানিনা।

( ৩ )

আজ স্বয়ংস্বত্ব অষ্টম-বার্ষিক জন্মদিন।

সরলা কত্কা কে নতুন শাড়ী পরাইয়া গলায় ফুলের মালা দোলাইয়া দিলেন, মুখে চন্দন দ্বারা চিত্র বিচিত্র আঁকিয়া দিলেন। তাহার পর তাহার বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ দস্ত দ্বারা কামড়াইয়া তাহারই ললাটে স্পর্শ করাইয়া দিয়া রক্তন-শালায় পায়স পাক করিতে চলিয়া গেলেন।

## মরণোন্মাদ

রামদীনের কিন্তু স্বপ্নমার এ বেশ দেখিয়া পছন্দ হইল না সে তাহাকে আপন ঘরে লইয়া গিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া হিন্দুস্থানী লাল শাড়ী বাহির বরিয়া পরাইয়া দিল ; সোণার গহনাগুলি খুলিয়া তৎপরিবর্ধে রূপার মোটা মোটা বালা, ঠাঁহুলী ইত্যাদি পরাইয়া দিয়া নিভৃত ছাদে লইয়া গেল ।

সরলা তাহাদের পদশব্দ পাইয়া বন্ধন-শালা হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, “দেখো রামদীন, ঞাড়া ছাদ—খুব সাবধানে থেকো ।”

রামদীন্ ছাদ হইতে তাকিল্যাবে কহিল, “তোমাব ঘে আজ বেশী নায়। পডে গেছে দেখছি, দিদিমণি । এলিবে তাকাবার ত তোমার দবকার নেই—আপনার কাজে মন লাগে ।” বলিয়া স্বপ্নমাকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া বারংবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করিল, “রামদীন্, মা বশ্চিল ঘে তোমার একটা আমার মত মেয়ে ছিল,—সত্যি ?”

রামদীন্ বিহ্বলনেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর কহিল, “ঈ—ছিল ।”

“তার জন্যে তোমার মন কেন্ন করে না ?

রামদীনের দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল । ঝাপসা চোখে স্বপ্নমার মুখের উপর সে যেন আপন কন্যার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল । অক্ষুটে ঘাড় নাড়িয় উত্তর দিল—“না” ।

## পাগল

রামদীনের চক্ষে জল দেখিয়া স্বম্মা হতভম্ব হইয়া ভিজ্ঞাশা করিল, “কেন ?—সে কোথায় ?

রামদীন স্বম্মাকে সবলে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, “তুই আমার এইখানেই ত রয়েছিস—কোথাও বাস্নি ত ?”

এ কথাটা স্বম্মার মনঃপূত হইল না। সে কোন মতে রামদীনের হাত ছাড়াইয়া চিবুকে বুঝাছুঠ ঠেকাইয়া ‘আড়ি’ ‘আড়ি’ করিতে করিতে এক পদ এক পদ করিয়া পিছাইতে লাগিল।

রামদীন আপনাকে হারাষ্টয়া, পবিপার্শ্ব সমস্ত বিষটা হারাষ্টয়া এক দৃষ্টে স্বম্মার দিকে চাহিয়া রহিল। স্বম্মা যত দূরে সরিয়া গাইতে লাগিল সে তত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে আপন কন্ঠার রূপ স্বম্মার সর্কান্ধে দেখিতে লাগিল। হয়ত দু’একবার তাহার কন্ঠার হিন্দুস্থানী নামটাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে স্বম্মা যখন ছাদের শেষ সীমায় আনিসার অত্যাশ্চর্য নিকটে গিয়া পৌছিয়াছে তখন রামদীনের চেতনা হইল। সে ছুটিয়া তাহার নিকট বাইবার পূর্বেই স্বম্মা আর একপদ পড়নে বাড়াইয়া দিয়া দ্বিতলের ছাদ হইতে একেবারে নীচে পড়িল।

‘হে’ ‘হে’ করিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। কেহ চোখে, কেহ মুখে জল ছিটাইতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, কিন্তু চরভ্রম্মের মত সে চক্ষু মুদিত হইয়া গেল—আর খুলিল না।

## মরণোন্মত্তা

স্বপ্নের স্রোত জোরে উন্মত্তের দ্বারা মার-পিট করিয়া অর্ধ-  
মৃত্যুবস্থার রামলীনকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন।

( ৪ )

বছর পাঁচ ছয় কেটে গেছে।

স্বপ্নের স্রোতের বাটার দক্ষিণ দিকে খানিকটা জমি আবহমানকাল  
ধরিয়া পড়িয়া আছে। শীতকালের সকালে মিষ্টি-মিষ্টি রোদে  
আশায় পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা প্রত্যাহই সেইখানে এসে  
আড্ডা জমায়। পুরুষ-পুরুষেরা ধরে এ আড্ডার কখনও ব্যতিক্রম  
ঘটেনি।

‘বিধু’, ‘জ্যোতি’ ‘কল্লনা’, ‘ভূতো’ প্রভৃতি ছেলে-মেয়েরা কেহ  
পকেটে, কেহ আঁচলে করিয়া ‘কুম্ভমবীজ’ দেওয়া মুড়ি আর  
খানিকটা করে পাটালি গুড় নিয়ে আজ সকাল-সকালই ‘ভাং গুলি’  
‘বাঘ-বন্দী’ ‘মারবেল ইত্যাদি খেলা আরম্ভ করে দিয়েছিল।

খেলিতে-খেলিতে হঠাৎ কল্লনা পূর্বদিকে তাকাইয়া শিহরিয়া  
বলিয়া উঠিল, “পাগল ! পাগল !”

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল, “কৈরে কৈ ?”

কল্লনা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, “ঐ দেখনা বাবুলা গাছের  
গোড়ায় বসে রয়েছে।”

বিধু বলিল, “তুই কি ক’রে জানলি—ও পাগল ?”

## পাগল

কল্পনা করিল, “দেখতে পাচ্ছি না, ও কি বকম ফ্যান-ক্যান  
ক’রে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। পাগল না হ’লে কেউ কখন  
জ্ঞানাল গানায় এসে অমনি ক’রে বসে থাকে ?”

ভূতো করিল, “না, রে না, ও পাগল নয়, পাগলরা কি চুপ  
ক’রে বসে থাকে ! পাগলরা ত লাফালাফি ক’রে বেড়ায়।”

জ্যোতি ভূতাকে ধমক দিয়া করিল, “হ্যা, তুই বড্ড জানিস।  
পাগল বুঝি কখনও এক বকমের হয় ? পাগল কত বকমের হয়,—  
কেউ হাসে, কেউ কাঁদে কেউ মারামারি করে, আবার কেউ কেউ  
চুপচাপই বসে থাকে—কা’রো সঙ্গে কথাও কয় না।”

অল্পবুদ্ধি কল্পনা পাগলের তত্ত্ব-বিশ্লেষণে মন দিতে পারিল না।  
করিল, “আচ্ছা বোধ হয় ওর শীত করছে, তাই ঐ বকম জডসড  
হয়ে বসে আছে। দেখছি না ওর গায়ে কিছু নেই, খালি একটা  
পাতলা জামা,—তাও আবাব ময়লা, ছেঁড়া।”

সহস্রভূতিটা বাল্য হতেই বালিকাদের হৃদয়ে যেমন করিয়া  
জাঁকিয়া বসে, বালকদের বুঝি তেমন বসে না। জ্যোতি  
সকলের বয়োজ্যোষ্ঠ, তাই তাচ্ছিল্যভাবে করিল, “হু, পাগলরা  
বুঝি শীত-গ্রীষ্ম বুঝতে পারে। সারাদিন পাগলামো করাই ওদের  
কাজ। পাওয়া দাওয়া পর্য্যন্তও ওদের মনে থাকে না।”

কল্পনা জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, ওর কি কেউ নেই ?”

“কি জানি থাকতেও পারে।”

## অরণোদাস

কল্পনা কহিল, “তাহলে তারা ওকে দেখে না কেন?”

“দেখে বৈকি ; না দেখলে ও না খেয়ে কখনও বেঁচ থাকতে পারে!”

মানুষকে মানুষ দেখিলে কখনও একজনের ঐক্য অবস্থা হইতে পারে না ভাবিয়া কল্পনা দয়াদ্রব্বের কহিল, “আমার ভাই ওকে দেখে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ও অনেকদিন হ্রত খেতে পারেনি। চলনা ওর কাছে ছ’টা মুড়ি দিয়ে আসি, বোধ হয় খেতে পারে।”

জ্যোতি দস্ত বিকলিত করিয়া কহিল, “ওঃ, তুই যে বড় দাতা হয়ে গেছিস! তোর ইচ্ছে হয় তুই যা। শুধু শুধু ওকে মুড়ি দেবার জন্তে আমাদের দায় পড়ে গেছে।” বলিয়া পুনরায় ‘বাঘ-বন্দী’ খেলায় মন দিল।

নির্মম জ্যোতির স্নেহ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও পাগলেব প্রতি অষ্টম বর্ষীয়া কল্পনার ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে বালিকা-জন-স্বলভ মনস্তা বিদূরিত হইল না। সকলেই আপন-আপন খেলায় মন দিল, কিন্তু সে খেলিতে পারিল না—উন্নয়ন হইয়া পাগলের দিকে তাবাত্তা বঠিল। একবার তার নিকটে গিয়া তার পাগল-জীবনের ভাঁটো বিচিত্র ইতিহাস শুনিবার জন্য কল্পনার প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। কিন্তু সাহস করিয়া পাগলের নিকট একলা যাইতেও তার ভয় কবিল।

জ্যোতির পার্শ্বে গিয়া কল্পনা মিনতি স্বরে পুনরায় কহিল,

## পাগল

“জ্যোতি চল্না ভাই ? আমি একলাই যেতে পারতুম কিন্তু ভয় করছে।”

জ্যোতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, “তোরা জন্তে আমি গিয়ে মার খাই আর কি !”

কল্পনা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, “সকলে মিলে গেলে মার কেন খাব ভাই ? আর ও তো চুপ্‌চাপ্‌ বসেই আছে,—কাউকে ত কিছু বলেনি। চল্না জ্যোতি—বাবি ? যদি বাস, তাহলে কাল দাদার বাস ৭৫কে তোকে একমুঠো মারবেল এনে দেব।”

এইবার জ্যোতি লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, “সত্যি বলছিস দিবি ?”

কল্পনা কহিল, “হাঁরে—সত্যি।”

জ্যোতি কহিল, “তিন-সত্‌র কর।”

কল্পনা তিনবাব ‘দোব, দোব, দোব’ বলিয়া শপথ করিল।

অপ্রত্যাশিত লাভের এবং পাগলের সহিত আশোদ করিবার প্রত্যাশায় জ্যোতি সকলকে ডাকিয়া বলিল, “চল্‌ যাওয়া বাক।”

পাগলটা কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছে কেহই তাহা জানে না। রংটা তংর গুব যে কাল—তা নয়। সাদা চুলগুলো সব উক্কো-খুক্কো ধুলো-মাখা, মুখে একমুখ দাড়ি। কপালের, গালের, নাকের চামড়াগুলো সব স্নগ্ধ হইয়ে ভাস্ক প’ড়ে প’ড়ে গেছে, আর তার মধ্যে বহুকালের ধুলো জমে জমে এমন বীভৎস দাগের স্টি



## অরণোক্তাস

হয়েছে যে সহসা দেখলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। চোক দুটো তার ঘোলাটে, মনে হয় যেন ভাটার মত বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। গায়ে তার মণের চেয়ে বড় একটা সাট, পরিধানের বাপডটা শত ছিন্ন,—হানে স্থানে গ্রন্থি দিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যাহোক ক'বে আবৃত ক'বে রেখেছে। হাত-পায়ের নখগুলো প্রায় আধ-ইঞ্চি কবে লম্বা হয়ে গেছে। পায়ের গোড়ালী দু'টো যেন 'ফুটী-ফাটা'র মত চোঁচিব।

ছেলেরা মল বাধিয়া তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্পনা অব্যবহিত একটু নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল, “এই তুই পাংল ?”

পাংল কোন উত্তর দিল না ; অর্থহীন উচ্ছ্বাস্ত করিয়া দামিয়া গেল।

কল্পনা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার বাড়ী কোথায় ?”

পাংল অঙ্গুলি নির্দেশে অদূরে বনের দিকে দেখাইয়া দিল।

কল্পনা কহিল, “তোমার কেউ নেই ?”

পাংল সজল চক্ষে ধীরে ধীরে একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—  
“না !” পবক্ষণেই একমুখ হাসিয়া বারংবার বহিতে লাগিল,  
“হী—হী, আছে—আছে ”

কল্পনা তাহাকে মুড়ি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কিদে পেয়েছে ?—মুড়ি খাবি ?”

## পাগল

পাগল তাহার শীর্ণ হাত দুটি কল্পনার দিকে বাড়াইয়া দিল। কল্পনাও আর স্থির থাকিতে পারিল না,—চুষকের আকর্ষণ যেন তাহাকে টান দিল। সে আঁচল খুলিতে খুলিতে যন্ত্র-চালিতের মত পাগলেব সন্নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র পাগল দুই হাতে কল্পনাকে জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া উর্দ্ধ্বাসে দৌড় দিল।

ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া আপন-আপন বাড়ীর দিকে ভয়ে ছুটিয়া গলাইল।

গ্রামময় বাষ্ট্র হইয়া গেল—গ্রামে ‘ছেলেধরা’ চুকিয়া কল্পনাকে সইয়া পলাইয়াছে। ছেলেরা ভয়ে আর কেহই বাহির হইতে চাহিল না।

\* \* \* \*

কল্পনার পিতা এবং অগ্রাণু গ্রামবাসীরা অনেক অন্তঃসন্ধানের পর পাগলের সন্ধান পাইল—স্তরেস্তরনাথের বাটার দ্বারে।

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—সরলা কল্পনাকে একহাতে ধরিয়া অগ্রহাতে পাগলের মাথায় ধীরে-ধীরে হাত ঝুলাইতেছেন।

পাগল বিকট বদন-ব্যাদন করিয়া বারংবার কহিল, “আমি অঁষকে খুঁজে পাব না, একি কখনও হয়, দিদিমণি!”

চক্ষুর জলে সরলার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি করুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, “বামদীন—আজ তোর এই অবস্থা।”

## কুলী

তখন রাজি বারোটা ।

লুপ্‌লাইনের শেষ ট্রেন খানি ‘হ’ ‘হ’ শব্দে রহমতপুর স্টেশন  
পাস করিয়া চলিয়া গেল ।

রামকিষণ সিগ্‌ভাল কেবিনে চাবি লাগাইয়া গৃহোদ্দেশে মুখ  
কিরাইতেই দেখিল—সম্মুখে একজন তদৈশীয় যুবক দাঁড়াইয়া !  
সাহসে ভর করিয়া নিজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি ?”

লছমন দুইপদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া লোটা ও কবল-জড়ানো  
বিছানাটা ভূমিতে রাখিয়া তাহার উপর ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া  
কহিল, “আমার নাম লছমন ।”

রামকিষণ তাহাকে চিনিতে পারিল না ।

লছমন জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার নাম ও রামকিষণ কাহার ?”

রামকিষণ বিস্মিত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি  
আমাকে কেমন ক’রে চিনুলে ? তোমার বাড়ী কোন্‌ জিলায় ?”

লছমন কহিল, “আরা জিলায় রামনগরে আমার বাড়ী ।”

রামকিষণেরও বাড়ী ঐ গ্রামে । সে আত্ম প্রায় আঠার

## কুলী

বৎসর বাঙালায় আসিয়া রেল চাকুরী করিতেছে। ইতিমধ্যে দেশে বাইবার তাহার একবারও অবসর হয় নাই। সাগ্রহে পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় বললে ?—রামনগর।”

লছমন কহিল, “হাঁ, আমি আপনার সহোদর হই। আপনি কি আমার নাম চিঠিতে শোনেন নি?”

রামকিষণ কহিল, “কৈ না!”

লছমনের নাম না শুনিবার এবং তাহাকে না জানিবার কারণ যথেষ্ট ছিল। আঠার বৎসর পূর্বে যখন সে বিবাহ করিবার পরই দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল তখন লছমনের জন্মই হয় নাই। প্রথম প্রথম যদিও তাহার মাতা এবং স্ত্রী তাহার সংবাদাদি লইবার জন্ত দেশ হইতে নাঝে-মাঝে পত্র লিখিত, কিন্তু এতাবৎকাল টাকা পাঠাইবার ভয়ে রামকিষণ সে সকল পত্রের কোন উত্তর দেয় নাই এবং তাহাদের খোজ লইবারও কোন চেষ্টা করে নাই।

যাহা হোক, চই-চারিটা কথা-বার্তার পর কতকগুলি বিবাসযোগ্য প্রশ্ন পাওয়া লছমনকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তাহার আর বিধা রহিল না।

রামকিষণ জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার খাওয়া-দাওয়া বোধ হয় কিছু হয়নি?”

লছমন কহিল, “না, সকালে ট্রেন থেকে নেমে অবধি আপনাকে পুষ্ক-তে-খুষ্ক-তেই সময় কেটে গেছে।”

## অন্নগোল্লাস

“ও তাই নাকি। তবে ঘরে চল,—কথা-বার্তা পরে হবে”—  
বলিয়া রামকিষণ বিছানা ও লোটাটা নিজেই উঠাইয়া ব্রাতাকে  
লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

( ২ )

রামকিষণ গৃহে প্রবেশ করিতেই সঞ্চাবিয়া তাহাকে নিকটে  
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ও আবার কে?”

রামকিষণ কহিল, “ও আমার ভাই হয়,—আজই দেশ থেকে  
এসেছে।”

সঞ্চাবিয়া বলিল, “তোমার যে দেশে ভাই ছিল, কৈ” সে কথা  
ত একদিনও আমায় বলনি!”

সঞ্চাবিয়ার ভ্রম বাংলা দেশেই। স্বামী গত হইবার পর  
হঠাৎ দুইটা পুত্র লইয়া প্রায় দশ বৎসর কাল দূরিয়া সে  
বানকিষণের সহিত স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্র বসবাস কাবয়া  
আসিতেছে। বানকিষণের মুখে সে পূর্বে শুনিয়াছিল যে রামকিষণ  
অবিবাহিত এবং দেশে তাহার মাতা ভিন্ন আপনার বলিতে আর  
কেহ নাই। কিন্তু আজ চঠাং একজনকে ভ্রাতা বলিয়া আপনার  
করিয়া লইতে দেখিয়া সে ইতাল হইয়া গেল। উপরন্তু, অবধা সংসার  
বৃদ্ধির ভয়ে এবং আপনার জনকে পাইয়া পাছে তাহাদের প্রতি মমতা  
ভ্রাস হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সঞ্চাবিয়া ক্রোধাধিতা হইয়া কহিল,

## কুলী

“এ রকম মিথ্যে কথা বলবার কি দরকার ছিল ? আগে জান্নলে আমি কখনই তোমার কাছে এসে পড়তুম না ।”

রামকিষণ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল, “আরে, আমিও কি চাই জানি ! এখন শুনুছি যে ও আমার ভাই হয় ।”

সঞ্চারিয়া কহিল, “তাহলে এইবার সত্যি ক’রে বন দোখ, দেশে তোমার আর কে কে আছে ?”

রামকিষণ আত্মবিফল হইয়া কহিল, “বান্ধলার আসবাব সময় দেশে মা ভিন্ন সত্যি আমার আর কেউ ছিল না ।”

“কেউ ছিল না তো এখন তোমার ভাই এল কোথা থেকে ?”

রামকিষণ জেরায় খতমত খাইয়া কহিল, “আহ, আমি দেশ থেকে চলে এলে পর এর জন্ম হয়েছিল ।”

ইহা সত্য কথা ।

সঞ্চারিয়া মনে মনে ভাবিত সে একাই বুঝি চরিত্রহীন । সে ভিন্ন আর অন্য সকলেই বোধ হয় সহ্য । তাই সে এতদিন নিজেকে ছোট করিয়া এবং লুকাইয়া বাখিবারই চেষ্টা করিত । কিন্তু এখন বুঝিল যে জগতে দোষহীন সংসার খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন ।

ছোট্ট একটা “তা বেশ” উত্তর দিয়া সঞ্চারিয়া চলিয়া যাইতেছিল, রামকিষণ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “অ’রও এক-জনকার খাবার তাহলে কবুতে হবে যে ? ছেলোটাবে দিখে আর পোয়া তিন আটা তাহলে আনিয়ে নাও ।”

## অরণোজ্ঞাস

সঞ্চারিয়া কহিল, “এখন আর উনানে আঙুন কোথা ? বাব্বা-বাব্বা ও বেলাই সব শেষ করে রেখেছি । পোয়াটাক ছাতু আনিবে নাও না ।”

রামাক্ষণ জিভ কাটিয়া কহিল, “রাম ! রাম !”

সঞ্চারিয়া কহিল, “কেন, ছাতু কি অশাস্ত ?”

“না, না তা বলিনি । তবে ভায়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা । যদি সে দেশে ফিরে গিয়ে আমার মায়ের কাছে, আমার জ্বীও—” বলিয়াই রামাক্ষণ থামিয়া গেল ।

এতদিন সঞ্চারিয়াকে রামাক্ষণ যে প্রতারণা করিয়াই আসিয়াছে তাহা সঞ্চারিয়া একদিনেই বুঝিয়া লইল । কোনরূপ ভাববৈলক্ষণ্য না দেখাইয়াই সে কহিল, “তোমার জ্বী নিজে কব্ব— এই ত ?”

রামাক্ষণ ত ডাড়াড়ি কহিল, “আরে না—না—না—আমার জ্বী কেন হবে ! আমি ত—”

সঞ্চারিয়া কথা চাপা দিয়া বিজ্ঞপ সহকারে হাসিয়া কহিল, “বুঝেছি, বুঝেছি—আর বলতে হবে না । আমি এখন সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ।” বলিয়া রুটীর ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল ।

( ৩ )

অহায়াস্তে রামাক্ষণ ও লছমন বাহিরে দুইখানি ষাটিয়ায় শুইয়া দেশেব কথা পাড়িল ।

## কুলী

রামকিষণ জিজ্ঞাসা করিল, “মা কেমন আছে ?”

লছমন কহিল, “মা ?—মা আজ হাস্যনানক হল মারা গেছে” ।

“এ্যা” বলিয়া রামকিষণ ষাটিয়ার উপর লাফাইয়া বসিয়া নাকি স্বরে ক্রন্দন আবৃত্ত করিয়া দিল । মিনিট পাঁচ ছয় পরে নাকি ঝাড়িয়া লইয়া আপনার ত্রীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল ।

লছমন আপন মনে কি একটা ভাবিয়া লইয়া কহিল, “বৌদি ?—”

“ঈ” বলিয়া রামকিষণ প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা তাহাব দিকে ই করিয়া তাকাইয়া রহিল ।

“বৌদি গো !—ওঃ—হো—হো—হো—” বলিয়া লছমন বিকটস্বরে কঁাদিয়া উঠিল । রামকিষণ ভাড়াভাড়ি ভ্রাতাব মূখের উপর হাত চাপা দিয়া কহিল, “একটু আশ্রু আশ্রু কঁাদ ভাই । তোমার বৌদি’র খবর বাড়ীর ভেতর গেল আমাব আব রক্ষা থাকবে না ।”

লছমনের ক্রন্দনের স্বর কমিয়া গেল । রামকিষণ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তাহলে সেও কি আর নেই ?”

লছমন কহিল, “না, তিনি মারা যাবনি , তবে—”

রামকিষণ ঢোক গিলিয়া লইয়া কহিল, “যাক বাঁচা গেল,—  
মরেনি তাহলে ? কিন্তু আবাব ‘তবে’ কি ?”

লছমন কহিল, “বছর দুই আগে তাঁর একটা স্থলর ছেলে  
হয়েছিল ।—”



## অরণোত্তাস

“এঁা !—ছেলে ?” বলিয়া রামকিষণ বিশ্ববিস্ফারিত চক্ষে লছমনের দিকে চাহিয়া রহিল ।

লছমন কহিল, “হাঁ, কিন্তু ছেলেটি বৈশ্বদিন বাচেনি,—ছ’মাসের মধ্যেই মারা গেল ।”

“যাক্ মারা গেছে ত !—তবু ভাল ।” বলিয়া রামকিষণ জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার বৌদি’ তারপর কি করলে ?”

লছমন কহিল, “ছেলেটা মারা যাবার দু’চারদিন পরে বৌদিকে’ও আবার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না । তারপর—”

“কেন ?—শোকে কোথাও বিবাগী হয়ে গিয়েছিল নাকি !”

“না, বিবাগী হয়ে যান্দি, পরে খবর পেলুম যে তিনি নাট-গাঁওয়ে দেবরাজের বাড়ীতে আছেন ।”

দেবরাজ রামকিষণদের বাটীতে প্রায়ই যাতায়াত করিত । রামকিষণের স্বীরও তাহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল । কিন্তু সম্মান জন্মাইবার পর হইতেই দেবরাজ এ বাড়ীতে আসা বাওয়া একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল । অবশেষে লছমনের উপদেশানুযায়ী রামকিষণের স্ত্রী এখন দেবরাজের বাটীতে একরূপ জোর করিয়াই বসবাস করিতেছে ।

রামকিষণ কহিল, “যাক্—বৈঁচে আছে তাহলে । তারপর আমাদের জমি জায়গার কি ব্যবস্থা ক’রে এলে ?”

লছমন কহিল, “জমি জায়গা ত বিশেষ কিছু ছিল না । দুটো

## কুলী

লাজল, হিনটে গরু, একটা মোষ আর ক' বিঘে জমী—এইত মোটে ছিল। তা সেগুলো সব বিক্রি ক'রে দিয়েই এখানে এসেছি।”

রামকিষণ মনে মনে ভাবিল যে তাহার দেশের সম্পত্তি ত একরূপ হস্তান্তরিতই হইয়া গিয়াছিল। এখন যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ ভাবিয়া কহিল, “তা বেশ করেছে।”

সেই সঙ্গে রামকিষণ লাভার কল্যাকার আহারের ব্যবস্থাপা ভাল করিয়া বন্দোবস্ত করিবার মনস্থ করিয়া রাখিল। কারণ যাহার নিকট হইতে কিছু পাইবার আশা থাকে তাহাকে খাতিব যত্ন করিবাব ইচ্ছাটা মানুষের স্বভাবই আসিয়া থাকে।

লছমন কহিল, “আমাকে যে এইবার একটা চাকরী ক'রে দিতে হবে দাদা।”

রামকিষণ আনন্দের সহিত কহিল, “তার জন্তে কোন ভাবনা নেই। কালই আমাদের কণ্টাক্তির সাহেবকে বলে সব ঠিক ক'রে দেব।”

কথা কহিতে কহিতে রাজি প্রায় দুইটা বাজিল দেখিয়া রামকিষণ কহিল, “তুমিও শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, আর আমাকেও চারটে বাজতেই সিগ্‌ন্যাল ঘর খুলতে হবে,—এইবার একটু ঘুমোবাব চেষ্টা করা যাক।” বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

## অরণোন্নাস

( ৪ )

কণ্ট্রাক্টর সাহেব লছমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকেই কি রামকিষণ পাঠিয়ে দিয়েছে ?”

লছমন কহিল, “আজ্ঞে, হাঁ হজুর ।”

“হজুর” শুনিয়া কণ্ট্রাক্টর সাহেব আপনাকে আপনিই বড় করিয়া গব্বের সহিত দেখিতে লাগিলেন । ইতিপূর্বে তিনি রামকিষণকে লছমনের জন্ত একটা চাকুরী দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তথাপি বোধ হয় আরো দুই-চারিটা “হজুর” শুনিবার জন্য তিনি একটু প্যাচ দিয়া কহিলেন, “চাকরী দেওয়া এখন ত বড় মুস্থিল বাপু ! আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে না হয় একটু চেষ্টা ক’বে দেখতুম ।”

লছমন কবজোড়ে মিনতি করিয়া জানাইল যে এতদিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর । ভোট ভাতার নিকট দুই-চারিদিন বসিয়া থাকিয়া খাইতে পারে, কিন্তু বেশীদিন অসম্ভব । তাহারও ত দুই চারিজন পোশ আছে ।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বেশী দ্রুত টাকা কড়ি কিছু সঙ্গে আনি ?”

লছমন কহিল, “আজ্ঞে, না হজুর ।”

“সে কি ! তোমার দাদা আমায় বলে যে দেশের নদন্ত বেচে তুমি টাকা নিয়ে এসেছ ?”

## হুলী

সম্পত্তি-বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিয়দংশ পাইবার আশাতেই রামকিষণ ভ্রাতাকে হুনজরে দেখিয়াছিল এবং চাকরীর জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু পরে সমস্ত অবগত হইয়া কহিয়াছিল, “ভাই আমি ছাপোষা লোক,—অন্ততঃ ব্যবস্থা করবার একটা চেষ্টা কর।” লছমন তাই চাকরীর জন্ত উত্তীর্ণ-পড়িয়া লাগিয়াছে। কহিল “হজুর, আমাকে চাকরী দিতেই হবে।”

কণ্ট্রাক্টর সাহেব কহিলেন, “তোমার কাছে এমন কিছু নেই—যাতে তুমি দুদিন খেতে পার ?”

লছমন কোমরের কাপড়, নাথার পাগড়া প্রভৃতি হুলিয়া দেখাইয়া জানাইল যে, এদলো খাইবার মত পয়সাও হাজার নাই।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব কহিলেন, “মেশে তোমাদের কি কি ছিল ?”

“আজ্ঞে, লাঙ্গল, গরু, মোষ, আর কিছু জাম ছিল।”

“সবই ছিল ত বিশেষে ১০০১৫ টাকার চাকরী করতে আসবার কি দবকার ছিল ?”

“আজ্ঞে হজুর, সেখানে পেট ভরে খেতে পেতুম বটে, কিন্তু কাঁচা পয়সা চোখে খুব কমই দেখতে পেতুম।”

কণ্ট্রাক্টর সাহেব মনে-মনে ভাবিলেন—নিরন্তর টাকার খোঁজ কবে অল্প সংস্থানের জন্ত, কিন্তু এই সব লোক উন্নত-পূরণে

## মরণোন্মত্ত

ও তৃপ্ত হয় না কেন। কেন তাহারা ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া সহরে ছুটিয়া আসে পরসী দিয়া অন্ন কিনিতে।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব অর্থের মোহের তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বেশ, কাল থেকেই তুমি কাজে লেগো।”

পরদিন ১০ টাকা মাহিনার একজন পাথর সরাইবার কুলীর পদে নিয়োজিত হইয়া লছমন কণ্ট্রাক্টর সাহেবকে খুব বড় করিয়া একটা সেলাম জানাইল।

( ৮ )

রাত্রি আশ্রাজ দশটা।

কোম্পানীরই জমিতে একটা পাতার ছাউনী দেওয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া লছমনের স্ত্রী সারাদিন অভুক্ত স্বামীর জন্ত ডাল-কটী সাজাইতেছিল। লছমন ততক্ষণ দাওয়ায় বসিয়া শিক্ত-কত্তা গুলাবীকে কখনও কাঁধে কখনও বা পিঠে লইয়া দিনান্তের শ্রাস্তি অপনোদন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ইত্যবসরে নবি সর্দার বাহির হইতে ডাক দিল, “লছমন বাড়ীতে এসেছ ?”

লছমন উৎকর্ষ হইয়া একবার ডাকটা শুনিয়া লইয়া বুঝিল—এ গলা তাহাদের সর্দারের। যে কার্যের জন্তই হোক আহার সমাধা না করিয়া লইয়া সে কোন মতেই গৃহের বাহির হইবে না স্থির করিয়া ডাকের কোনরূপ প্রত্যুত্তর দিল না।

## কুলী

তুই চারিবার ডাকিবার পরও কোন জবাব না পাইয়া নবি সর্দার বেড়ার নিকটে আসিয়া ফাঁক দিয়া দেখিয়া কহিল, “কাণে কি কালা হয়েছে ? এতক্ষণ ধরে ডাকছি একটা সাড়াও দিতে পার না ?”

লছমন গুলাবীকে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল, “ওঃ সর্দার!—আমি ভেবেছিলুম আর কেউ হবে।”

“তা যাই ভাব—এখন চল।”

লছমন আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায়।”

নবি সর্দার কহিল, “কুলী নদীর পুলের কাছটা আবার ভেঙ্গে গেছে। আজ রাত্রে না ঠিক করে ফেললে ভোরের ট্রেন পাশ করিতে পারবে না।”

লছমন কহিল, “আমার যে এখনও পাওয়া হয়নি—সর্দার ?”

সর্দার কহিল, “খাওয়ার জন্তে কিছু ভাবতে হবেনা,—কণ্ট্রাক্টর সাহেব সে ব্যবস্থা করে দেবেন।”

মুখের আহায় ফেলিয়া রাগিয়া বিনা বাদ-প্রতিবাদে লছমন সর্দারের পিছনে পিছনে বাহির হইয়া গেল।

কুলী নদীর পুল লছমনের গৃহ হইতে প্রায় ১৫।১৬ মাইল দূর। লাইন ঠিক করিয়া বসাইতে এবং মেরামতাদি কার্যের জন্ত তাহাদের তিনদিন কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে কেহই একবেলার জন্তও বাড়ী আসিতে পায় নাই।

## বরগোলাস

আজ বৈকাল পাঁচটায় কুলী-গাড়ী আসিলে সকলেই বাড়ী  
কিরিতে পাইবে ভাবিয়া সকলেই নিজ নিজ যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড়  
গুছাইয়া নিকটস্থ স্টেশন উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছে, এমন  
সময় কন্ট্রাক্টর সাহেব একথানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন হইতে নামিয়া  
সন্টারকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমাদের কুলী-ট্রেন আজ আর  
আসবে না। আজকের রাতটাও তোমরা এইখানে কাটিয়ে দাও।”

আজ রাত্রিও এইখানে কাটাইতে হইবে শুনিয়া লছমন কন্ট্রাক্টর  
সাহেবের নিকটে যাইয়া সেলাম করিয়া কহিল, “হজুর আজ আমাকে  
যেরে কিবুতেই হবে। আমার মেয়ের জন্তে আমার মন বড়  
খারাপ হইয়াছে। তাকে না দেখে আমি একদিনও থাকিতে  
পারি না।”

কন্ট্রাক্টর সাহেব তাহার কথার কর্ণপাত করিলেন না।  
গাড়ী চাউনি দিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে যাইয়া উঠিয়া  
বসিলেন।

লছমনও আর স্থির থাকিতে পারিল না, তৎপশ্চাৎ ছুটিয়া  
যাইয়া চলন্ত-গাড়ীর হাতল ধরিয়া ঝুঁলিয়া পড়িল।

কন্ট্রাক্টর সাহেব তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন, “নেমে যাও—  
নেমে যাও,—এ গাড়ী তোমাদের জন্ত নয়।”

লছমন হাতলটা দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “হজুর,  
আমি ভেতরে যেতে চাই না,—বাইরে বসেই আমি চলে যাব।”

## কুলী

বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও কথা শুনিল না দেখিয়া কণ্ট্রাষ্টির সাহেব তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিলেন, “এ সব বে-আইনী চলতে পারে না। তোমার জন্তে আমারও চাকরী যাবে নাকি।”

লছমন সে ধাক্কা সামলাইতে পারিল না,—ছিটকাইয়া প্রাচীরের উপর যাইয়া পড়িল।

তিন মাস পরে ভগ্নপদ লইয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া শুনিল, তাহার চাকরী বরখাস্ত হইয়া গিয়াছে। গৃহের সন্ধানে যাইয়া দেখিল,—কেবল দুই একটা বাঁশের খোঁটা তাহার আবাসস্থল নির্দেশ করিয়া দিতেছে মাত্র। নিকটস্থ অধিবাসাদিগের নিকট জট-কন্ডারও কোন সংবাদ পাইল না। অবশেষে ভ্রাতার সন্ধানে বাহির হইয়া খবর পাইল যে সেও কোথায় বদলী হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কোন স্থানে বদলী হইয়া গিয়াছে সে কথা কেহই বলিয়া দিতে পারিল না।

লছমন ভাবিল,—এখন উপায়!—থলকে কে ডাকিয়া চাকুরী দিবে!—কে আর তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইবে! দেশের কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণটা একবার ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—উদরারনের সেখানে কখনও তো অভাব হইত না!

\* \* \* \* \*

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।



## অরণোত্তর

কাল-বৈশাখী তাহার বৈকালিক ক্রন্দ-মৃত্যু শ্রুত করিয়া দিয়াছে।

সারাদিনের ভিকালরূপ চাল গুলি আঁচলে বাঁধিয়া লছমন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ফুলী নদীর ধারে আসিয়া পাক করিবার ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময় নদীর মধ্যস্থল হইতে কাহার যেন আর্জনাৎ শোনা গেল,—“বাঁচাও, বাঁচাও।”

লছমন চাহিয়া দেখিল,—একপান্না নৌকা উন্টাইয়া ভাসিয়া যাইতেছে এবং তাহারই নিকট হইতে মল্লগের আর্জ-স্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

লছমন আর ভাবিবার অবসর পাইল না, চাল গুলি ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া রাম নাম করিয়া উন্নত তরঙ্গের বুকে কাঁপ দিল।

নৌকার সোঁরকটে যাইয়া লছমন বিস্মিত হইয়া দেখিল— তাহাদের সেই পরিচিত কণ্টাক্তির সাহেব নৌকার একপ্রান্তে ধরিয়া টাঁকায় করিতেছেন।

কখনও কাঁধে করিয়া, কখনও পা ধরিয়া, কখনও নিজে ডুবিয়া মাথায় করিয়া লছমন কোনক্রমে তাঁহাকে তীরে আনিয়া তুলিল, কিন্তু লছমনের আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না। চির-বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায় সেই অভূত শীর্ণমেহটা নদীতীরে ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িল।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব হুস্থ হইয়া লছ  
নিরীক্ষণ করিয়া অক্ষুটে কহিলেন, “  
লছমন !”

নদী-তীরের উন্নত বাতাস লছমনের হুটু  
টগ্‌বগানির সহিত যোগ দিয়া কণ্ট্রাক্টর সাহেবের ক  
দিল,--“হাঁ,—সেই বটে !”

সমাপ্ত

সুখ।

খ মুবোপাধ্যায় প্রণীত

কবিতার বই

। গুলি শিল্প হ'তে যুদ্ধের পর্য্যন্ত কষ্ট  
হে। বাড়ীতে একখানি কিনে রাখবেন—  
যেনব অনেক কাজে আসবে।

—মূল্য আট আনা—

কমলা বুক ডিপো লিমিটেড্

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

“সুখা”

—সম্বন্ধে চ'একটা মতামত—\*

\* \* \* সংসারে নীতিবণ্ড যথেষ্ট প্রয়োজন। শ্রীমানের  
যে কবি জনোচিত কল্পনা-শক্তি আছে তাহা বহুস্থানে তুষ্পষ্ট।  
\* \* \* সহজই গীতাকে মনে করাইয়া দেয়। \* \* \* একটা  
সহজ সুরে একটা মধুর সান্দ্র্য পুস্তকটাকে উপভোগ্য করিয়াছে।  
অতিমাত্রায় কারুকার্যের মধ্যে সহজ প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া যায়;  
কিন্তু আলোচ্য পুস্তকটিতে সহজ ভাবময় প্রাণের প্রকাশ যথেষ্ট  
সম্ভব। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

“চুঁচুড়া বার্তাবহ”

৫ঠা আশ্বিন, ১৩৩৭ সাল।

\* \* \* সুন্দর বাঁধাই ও মনোবশ ছাপা—ছোট কবিতা  
কাদ, মামুলী প্রেমের কবিতা নয় বলিয়াই “সুখা”  
গীতি দান করিয়াছে।

“ভগ্নদূত”

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল









